Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

এলেম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লামিয়া খাতুন

রোলঃ 227020225

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

এলেম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লামিয়া খাতুন

রোলঃ 227020225

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " এলেম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লামিয়া খাতুন, আইডিঃ 227020225বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " এলেম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

লামিয়া খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

লামিয়া খাতুন

আইডিঃ 227020225

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:

ইসলাম একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ইসলামের তরবিয়ত সর্বব্যাপী। জীবনের কোন দিকই ইসলাম উপেক্ষা করে নি। মানুষ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে উঠে তা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। তাই মানুষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ইত্যাদির বিকাশের জন্য ইসলামের রয়েছে সর্বপ্রকার কল্যাণকর ও চিরন্তন তরবিয়ত। এসকল তরবিয়তের মূল চাবিকাঠি হলো ইলম। ইলম হলো তরবিয়ত ও ইবাদতের প্রথম ধাপ। ইলমের অধিকারী ব্যক্তি সম্ভ্রান্তযদিও তার পিতামাতা নীচ বংশের হন। ইলম সর্বদা তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে।

ইলম ছাড়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কোন জাতি অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ ঐ জাতির নিকট একজন নবীকে অহি-র জ্ঞানসহ পাঠিয়েছেন। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা লুটতরাজ, রাহাজানি, গোত্রকলহ, যেনা-ব্যভিচার সহ যাবতীয় অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে পর্যায়ক্রমে অহি-র জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে সূদ, ঘুষ, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার, গুম ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে। তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ আজ বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জিত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল প্রকৃত শিক্ষা বা ইলম।

ইলমের পরিচয়

ইলম শাব্দিক অথে জাহল (অজ্ঞতা) এর বিপরীত। এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত। পারিভাষিক অর্থে 'ইলম হলো (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানা। আলিমগণ বলেছেন, নিশ্চয় 'ইলম (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট। ইলম আরবী শব্দ العلم মাছদার থেকে উৎকলিত। অর্থ الادراك والمعرفة বুঝা, উপলব্ধি

OXFORD dictiornary-তে ইলম বা জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

'The information, understanding and skills that you gain through education or experience'.

হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেন, ইলম হলো এমন নূর গোনাহ করলে যা মিটে যায়, গোনাহগার যা হাসিল করতে পারে না। কিছু শব্দ শেখার নামই ইলম নয়। তাই যদি হতো তাহলে জার্মান ও বৈরুতের খৃস্টানরা-যারা আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বড় বড় আদীব-তারাও আলেম হতো। বোঝা গেলো, শুধু শব্দজ্ঞানই ইলম নয়। ইলম প্রকৃতপক্ষে একটা নূর। পবিত্র কুরআনেও একথা এসেছে,
قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। (সূরা মায়েদা ১৫)
আলোচ্য আয়াতে ইলমকে নূর বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে ইলমকে رُوحٍ বলা হয়েছে । যেমন-
وَاَيَّدَہُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡہُ

তিনি তাদের নিজস্ব আত্মা দিয়ে সমর্থন করেছিলেন'আল্লাহ পাক তাকে শক্তিশালী করেছেন ইলম দিয়ে। (সূরা মুজাদালাত ২২)

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইলমকে সরাসরি নূর বলেছেন,
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
'আমি তার জন্য নূর দিয়েছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে চলে।'(সূরা আনআম ১২২)
ইলম এমন নূর যা থাকলে মনে কোনো ভয়-ডর থাকে না। চতুর্দিক থেকে শত্রু ঘিরে ফেললেও ঘাবড়ে যায় না। রাসূল সা. কে একবার একা পেয়ে এক বুদ্ধ খাপখোলা তরবারি উঁচিয়ে বলেছিল, তোমাকে কে বাঁচাবে আমার হাত থেকে? রাসূল সা. তখন অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলেছেন, আল্লাহ বাঁচাবেন। আল্লাহ সেদিন বাঁচিয়েছেন। আলেমগণও তেমনি নির্ভীক হয়ে থাকেন। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে তাদের রয়েছে পূর্ণ মারেফত। তারা জানেন, আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। আর আল্লাহর কর্মে কোনো না কোনো হেকমত অবশ্যই থাকে।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য

আমরা ইলম অর্জন করবো শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তষ্টি হাসিলের জন্য। আল্লাহর সন্তষ্টি ছাড়া দুনিয়াতে যত কাজ আমরা করি তা হবে বে-সাওয়াব। অথচ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য স্পষ্ট এক হুকুম হলো আমি জ্বিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার এবাদতের জন্য (সূরা যারিয়াত-৫৬)। তাহলে আমাদের জন্য দুনিয়াতে সব কাজ করার আগে এই খেয়াল করা দরাকার যে, আমি যে কাজ করছি তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি (?) না অন্য কেন উদ্দেশ্যে করছি (!)। তাই শুধু ইলম নয় বরং সব কাজের আগে আমাদের এই নিয়ত করা উচিত যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই কাজ করছি। ইলমের উদ্দেশ্য হল আমল করা। আল্লাহ পাক আমার ওপর কি আদেশ করেছেন আর কি নিষেধ করেছেন তা জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। গুটিকতক কিতাবের মালুমাত হাছিল করার নাম ইলম নয়। সাহাবায়ে কেরাম যা শিখতেন সাথে সাথে। আমল শুরু করে দিতেন। এক আয়াত শিখতেন তা আমলে পরিণত করে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা, আরব ছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল আরবী। আরবী শিখতে তার নাহ সরফের প্রয়োজন ছিলনা। এদিকে কোরআন শরীফও নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। স্বভাবতই কোরআন বোঝার জন্য তাঁর তরজমার প্রয়োজন ছিল না। তবুও তিনি বলেছেন: "সূরায়ে বাকারা শিখতে আমার দু'বছর লেগেছে। একজন আরবের সূরায়ে বাকারা শিখতে দু'বছর লাগার কী কারণ? কারণ একটাই, এক আয়াত পড়তেন আমলে অভ্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন। তাহলে মূল কথা হলো আমরা ইলম অর্জন করবো শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য।

ইলমের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ .

মুমিনদের সকলে এক সাথে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবাহ-১২২।

এ আয়াতের আলোকে জানা গেল যে, দীনি আহকাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা করা এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা শত্রুর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ চলাকালেও বর্জন করা যায় না। তখনও একটি দল জেহাদে লিপ্ত না হয়ে এ শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হয়। যুদ্ধের সময়ই যেখানে ইলম অর্জনের এত গুরুত্ব রয়েছে, সেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় তার গুরুত্ব কী পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন ইবাদত যতই বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন তা শরয়ী নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী হওয়ার পূর্বশর্ত হল শরয়ী ইলম ও জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এ ইলম অর্জনের দু'টি পন্থা রয়েছে।

১. মাদরাসায় নিয়মতান্ত্রিক দরস- তাদরীসের বিশেষ ব্যবস্থা।

২. দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবস্থা। [তাজদীদে তা'লীম-১৬১]

স্মরণ রাখতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সকল কাজের শেকড়। যা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে কাজ করার লোক কিভাবে তৈরি হবো তাবলীগ: পৃ. ল৮৪, খ. ১৬]

মোটকথা, উক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, ইলমেদীনের উপর পৃথিবীর নেজাম ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে।

ইলমের প্রকার

ইলম দুই প্রকার। যথাঃ

1। ইলমুদ্দীন,
2। ইলমুশ শারঈ।

আর এখানে 'ইলম (জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো 'ইলমে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)। আর 'ইল্মে শারঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর 'ইল্ম (জ্ঞান)।"

ইলম ও মা'লুমাতের মাঝে পার্থক্য

হাকিমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, ইলম ও মা'লূমাত এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যেমন ক্ষীণ দৃষ্টির কেউ হাজার মাইল সফর করলেও তার দেখাশোনা হয় কম। তাছাড়া যা দেখে তা-ও ভাসাভাসা। পক্ষান্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কেউ এরচে' কম সফর করেও বেশি দেখতে পারে। ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। আমাদের মাঝে আর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী সাহেবের মাঝে পার্থক্য ঠিক তেমনি। আমাদের জানাশোনা বেশি, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি কম। আর হাজী সাহেবের জানাশোনা কম, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি বেশি। প্রকৃত ইলম হলো, সুস্থ উপলব্ধি যা সঠিক পথ দেখায় এবং নিশ্চিন্ত গন্তব্যে পৌঁছায়। এই ইলম শুধু পড়াশোনার মাধ্যমে হাসিল হয় না। এর প্রধান উপায় হলো, দোয়া-মুনাজাত ও তাকওয়া-পরহেজগারি।

আলেম কাকে বলে? মুত্তাকী ও মুত্তাবিয়ে সুন্নাতকে আলেম বলে। কেননা মওলবীর নিসবত মাওলার দিকে; মানে মাওলাওয়ালা তথা আল্লাহওয়ালা।

আজকাল অধিকাংশ আলেম দরস-তাদরীস নিয়ে মশগুল। ইসলাহের কোনো ফিকির নেই। দরস-তাদরীসের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কোড ইসলাহের প্রয়োজন আরো বেশি। অনেকের মধ্যে দেখা যায়, ইলমের ফিকির অত্যধিক, কিন্তু আমলের ফিকির

নেই, কিতাব শেষ করার তাকিদ খুব, কিন্তু ইসলাহের তাকিদ নেই মোটেও। দিনরাতে কত রকম গোনাহ যে করে সে উপলব্ধি পর্যন্ত নেই। বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস নিয়ে গেল, যেখানে সেখানে ফেলে রাখল, ওদিকে মালিক খুঁজে হয়রান। বা কারো সঙ্গে কথা দিয়ে কথা রাখল না। ইত্যাকার হাজারো আখলাকী অপরাধে লিপ্ত, অথচ জানাশোনার কমতি নেই। আসলে জানাই যথেষ্ট নয়। শয়তানও জানে অনেক। অনেক বড় আলেম শয়তান। অনেক আলেমকে পর্যন্ত ধোঁকায় ফেলে দেয়। আর জানা কথা, কাউকে ধোঁকায় ফেলতে হলে তারচে' বেশি জানতে হয়। শয়তানের অপরাধ হলো, তার জানা ছিল বেশি, কিন্তু মানা কম। হাদীসে এসেছে, যে ইলম আমলের জন্য নয় তা জাহান্নামের কারণ হবে। আজকাল ছাত্ররা এতটাই গাফেল যে, নিজেদের ইসলাহের সামান্যতম ফিকিরও নেই। অনেকে আছে, ইচ্ছেকৃত গোনাহ করে না, তবে অনিচ্ছায় হয়ে যায়।

আল্লাহর নিকট ইলমের মর্যাদা

আল্লাহ পাক মানুষকে সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এতেই প্রতীয়মান হয় ইলমের মর্যাদা তার কাছে কতখানি। অথচ নির্দেশ দেয়ার মতো আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাওহীদ ছিল যা ছাড়া ঈমান লাভ হয় না, 'আর ঈমান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। রিসালাত ছিল যা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে অধিক প্রিয় হবো তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং পৃথিবীর সবকিছু থেকে, এমনকি তার নিজের জীবন থেকেও। আল্লাহ পাক আখেরাতের কথা বলতে পারতেন। কেননা আখেরাতের ভয়ে মানুষ নেক আমল করে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু সবকিছু রেখে আল্লাহ পাক মানুষকে প্রথমে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং বোঝা গেলো, এ উম্মতের মাঝে ইলমের চর্চা হবে বেশি।

দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি স্বয়ং আল্লাহর উৎসাহ প্রদান

সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা আলা। অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জানা। সবকিছুর উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যপ্ত। কুরআনে আছে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি জ্ঞান দান না করলে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো। আল্লাহ তা' আলা বলেন, আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন। আল্লাহ তা' আলা আরো বলেন, দয়াময় মেহেরবান আল্লাহই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন।'

মানুষ ইলম অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিজেদের মাঝে ইলম প্রচার করবে এটাই আল্লাহর দাবী।

আর এ জন্যই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

وما كان المؤمنون لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نفر من كل فرقة منْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

'সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বের হবে, যাতে তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়'।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইলমের ফযীলত

হযরত আদম আ. কে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সেজদার পাত্র বানিয়েছেন। কী ছিল এর কারণ? পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আল্লাহ তাআলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। [সূরা বাকারা ৩১]

এ সকল জিনিসের নাম একমাত্র আদম আ. জানতেন, ফেরেশতাগণ জানতেন না। ইলমের বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সুউচ্চ মাকাম দান করেছেন।

হযরত দাউদ আ. কে আল্লাহ তাআলা বিরাট রাজত্ব দিয়েছেন। কী ছিল এর কারণ?

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَ عَلَّمْتُهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ
بَأْسِكُمْ
'আর আমি তাকে লৌহবর্ম বানানোর কৌশল শিক্ষা দিয়েছি। যেন তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। [সূরা আম্বিয়া ৮০]
আল্লাহ তাআলা তার হাতে লোহাকে মোমে পরিণত করে দিয়েছেন। ফলে তিনি অতি সহজে বিভিন্ন ধরনের ডেক-ডেকচি, লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ তৈরি করতে পারতেন।

হযরত সুলাইমান আ. কে আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীর ওপর একচ্ছত্র রাজত্ব দিয়েছেন।
জিন-ইনসান ও পশুপাখিসহ সমস্ত সৃষ্টিজীবের ওপর ছিল তার ক্ষমতা। এর কারণও ছিল ইলম।
তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,
أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
'হে লোক সকল! আমাকে পশুপাখির ভাষা শেখানো হয়েছে। আর আমাকে সব জিনিস দেয়া হয়েছে। [সূরা নমল ১৬]
পশুপাখি ও কীট-পতঙ্গের ভাষা বুঝতে পারাও এক প্রকার ইলম।

হযরত ইউসুফ আ. কে যখন তার ভাইয়েরা বিক্রি করে দিল তখন তার কোনো ইলম ছিল না। তাই কুরআনের ভাষ্যমতে তার মূল্য ছিল কয়েকটি মাত্র টাকা।
তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,
وشروه باس بخسٍ دَرَاهِم مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِرِينَ
তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে-মাত্র কয়েক দেরহামের বিনিময়ে। তারা ছিল তার ব্যাপারে নির্লোভ। [সূরা ইউসুফ ২০]
তারপর যখন হযরত ইউসুফ আ. প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম ও হেকমত দান করলেন; তখন তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।
পবিত্র কুরআনে এসেছে,
وَلَمَّا بَلَغَ أَهْدَةً أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَكَذٰلِكَ تَجْرِى الْمُحْسِنِينَ
স্বখন তিনি যৌবনে উপনীত হলেন, আমি তাকে ইলম ও হেকমত দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। [সূরা ইউসুফ ২২]

এই ইলম ও হেকমত পেয়েই তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার আবেদন করেছেন।
আল্লাহ পাক বলেন,
اجْعَلْنِي عَلَى خَرَّ ابنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
'আমাকে খাজাঞ্চিখানার দায়িত্ব দিন। কেননা আমি সর্বোত্তম সংরক্ষক ও জ্ঞানী [সূরা ইউসুফ ৫৫]

হযরত খিজির ছিলেন একজন বিশিষ্ট অলী। ইলমের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত মুসা আ.-এর মত মহান নবীর উস্তাদ বানিয়েছেন।
হযরত খিজির সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمَان
'তারা দু'জন আমার এমন এক বান্দাকে পেল যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে রহমত দিয়েছি এবং নিজের পক্ষ থেকে ইলম দিয়েছি। [সূরা কাহাফ ৬৫]

রাসূল সা. সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا
'তিনি আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনাং ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন। [সূরা নিসা ১১৩]
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে আরো বলেন,
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

'হে নবী! আপনি বলুন, যে জানে আর যে জানে না তারা কি বরাবর। জানী লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে [সূরা যুমার ৯]
জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞানীদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বিরাট।

কারো গর্ব করার অধিকার থাকলে আলেমগণই করতে পারেন। কেননা তারা নিজেরাও সঠিক পথে আছেন এবং অন্যদেরও সঠিক পথ দেখান। পক্ষান্তরে সম্পদ না থাকাই গর্বের বিষয়। কেননা সম্পদ সাপের মত, দেখতে চমৎকার কারুকার্যখচিত, কিন্তু ভিতরে বিষে ভরা। তেমনি সম্পদও ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের অন্যতম মাধ্যম,

কিন্তু সম্পদই সকল অনিষ্টের মূল। সম্পদ নিয়ে যদি কেউ গর্ব করে সে যেন সাপ নিয়ে গর্ব করল

হাদীসে বর্ণিত ইলমের ফযীলত

হাদীসের কিতাবসমূহে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর অযোগ্যকে ইলম শেখানো শুকরের গলায় মণিমুক্তা ও স্বর্ণ পরানোর নামান্তর।

হযরত কাসীর ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার দামেশকের মসজিদে হযরত আবুদ দারদার সঙ্গে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে এক লোক এসে বলল, হে আবুদ দারদা! আমি মদিনা থেকে এসেছি। তবে কোনো প্রয়োজনে আসিনি। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ চলে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পথে চালাবেন। আর ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আর আলেমের জন্য আসমান যমিনের সবকিছু ইস্তিগফার করে, পানির মাছ পর্যন্ত। একজন আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন পূর্ণিমার রাতে তারকারাজির ওপর চন্দ্রের মর্যাদা যেমন। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দিনার দিরহাম রেখে যান না। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান ইলম। যে ব্যক্তি সেই ইলম অর্জন করল সে বিরাট কিছু অর্জন করল।

আরেক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,
'রাসূল সা. বলেছেন, কেউ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল ব্যতীত; সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। [মুসলিন ১৬৩১]

আরেক হাদীসে রাসূল সা. বলেন,
'কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী খোদ কল্যাণকারীর মত। [তিরমিযী ২৬৭০]

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত,

'রাসূল সা. বলেছেন, দু'টি ব্যাপারেই শুধু হিংসা করা যায়; যাকে আল্লাহ পাক অঢেল সম্পত্তি দান করেছেন আর সে হকের পথে তা দেদার খরচ করে। যাকে আল্লাহ পাক হেকমত দান করেছেন আর সে ন্যায় ফায়সালা করে এবং মানুষকে তা শেখায়। [বুখারী ৭৩]

অন্য হাদীসে রাসূল সা. বলেন,
'মানুষ খনি সদৃশ; জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলাম যুগেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, যদি তারা ফকীহ হয়। [বুখারি ২৬৩৮]

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

'আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকেই 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' তথা দ্বীনী বুঝ দান করেন। আল্লাহ দাতা, আমি বণ্টনকারী। এই উম্মত সর্বদা আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর নির্দেশ (তথা কেয়ামত) আসার আগ পর্যন্ত।

ইলম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবীদের প্রেরণ

নবীদেরকেই মানবতার প্রকৃত শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর তাদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণের ইলম। নবীগণ সারাজীবন মানুষকে তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের ইলম শিক্ষা দিয়ে গেছেন।তাই আদর্শ শিক্ষা ছিল তাদের শিক্ষা। তাদের শিক্ষার বাস্তব রূপ হলো আল কুরআন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে, তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।'

আর এটি জানা বিষয় যে, নাবীগণ (মানুষকে) যে 'ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহর শরী'আত (বিধান) সংক্রান্ত ইলম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আরও বলেন,

এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যেনো বিরতি দিয়ে দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও।আর আমি এটা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত (নবী ও কিতাব) আসবে, তখন যারা আমার নবী ও কিতাবকে অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ থাকবে না।

আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে আকাবির তথা পূর্বসূরীদের চমৎকার সব বাণী পাওয়া যায়।

এক. হযরত ঈসা আ. বলেন,

'যে ইলম হাসিল করে এবং এর ওপর আমল করে, আসমানের রাজ্যে তাকে মহামনীষী হিসেবে ডাকা হয়। [আল জামে লি আখলাকির রাবী ১৭]

দুই. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন

'আসমানে তারকারা যেমন যমিনে আলেমগণও তেমন; তাদের মাধ্যমে হেদায়েত পাওয়া যায়।' অর্থাৎ তারকারা হলো আসমানের সৌন্দর্য আর আলেমগণ হলেন যমিনের সৌন্দর্য।

তিন, হযরত আবু বকর বদরী বলেন,
আমি একবার সাহল ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট গেলাম। আমার হাতে কলম দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি লেখালেখি করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিছু কিছু লিখি। তখন তিনি বলেন, দোয়া করি, মৃত্যুর সময় যেনো তোমার হাতে কলম থাকে। মনীষীগণ বলেন
'ইলম অন্বেষণ কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।' অর্থাৎ সারা জীবন ধরেই কিছু না কিছু শিখতে থাক।

চার, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী রহ. বলেন,
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাওহীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সঙ্গে আলেমদেরকেও সাক্ষী রেখেছেন-
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَٰئِكَةُ وَأُولُوا
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও। [সূরা আল ইমরান]
আল্লাহর বিধানমতে অবিশ্বস্ত কেউ সাক্ষী হতে পারে না। তো বোঝা গেলো, আলেমগণ আল্লাহর নিকট বিশ্বস্ত এবং সাক্ষীর উপযুক্ত।

পাঁচ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,
'মানুষ খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে ইলমের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কেননা খাদ্যের প্রয়োজন হয় দিনে দু'একবার। পক্ষান্তরে ইলমের প্রয়োজন পড়ে প্রতি-মুহূর্তে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে।'

ছয়. হযরত আলী রা. তার এক শাগরেদকে লক্ষ্য করে বলেন,

'হে কুমাইল, ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কারণ ইলম তোমাকে নিরাপত্তা দেয় আর সম্পদের নিরাপত্তা তোমাকে দিতে হয়। আলেমগণ শাসক আর ধনীরা শাসিত। সম্পদ খরচ করলে কমে আর ইলম শেখালে বৃদ্ধি পায়। [ইহইয়াউল উলুম১৪]

তিনি অন্যত্র বলেন,

'আলেমগণ রোজাদার, তাহাজ্জুদগুজার ও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণের চেয়ে উত্তম। কেননা কোনো আলেম মারা গেলে ইসলামে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয় অন্য একজন আলেম দ্বারাই তা পূরণ হতে পারে।[ইহ্ইয়াউল উলুম ১৪]

তিনি আরো বলেন,

'মহান আল্লাহ পাকের বণ্টনে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের ভাগে পড়েছে ইলম আর শত্রুদের ভাগে পড়েছে সম্পদ। সম্পদ তো অতি দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আর ইলম বাকি থাকে চিরকাল।' সম্পদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম সর্বদা বাকি থাকে। যার কাছে ইলম আছে তার অন্যকিছু চাই না-না বন্ধু-বান্ধব, না আত্মীয়- স্বজন। কোনো রাজা-বাদশা এতটা শান্তি-স্বস্থি পায় না আলেমগণ যতটুকু
পেয়ে থাকেন। কারণ, বাদশাদের তো নিজেদের পরিমণ্ডলেও সদা সতর্ক থাকতে হয়, কোথাও তারা নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে একজন আলেমকে নির্জন জঙ্গলেও সতর্ক থাকতে হয় না, সবখানেই তারা নিরাপদ।

সাত, হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন,

আমি একবার ইমান মালেক রহ.-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ কাগজ কলম রেখে নফলে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করলে তিনি বলেন,
যে কাজ থেকে উঠে নফলে দাঁড়ালে সে কাজই উত্তম ছিল।

আট. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

'আমার নিকট ইলমী শুগোল নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[আল মাজমু]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখীর রা. বলেন একই কথা,

'আমার নিকট ইলমের ফযীলত ইবাদতের চেয়ে প্রিয়।[জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৩৯]

নয়. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন.
'হয় আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও; নয় তাদের মহব্বত করো, নয় তাদের অনুসারী হও; অন্য কিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য।[জামেয়ু]

হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,
আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে বললাম, যদি পার আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও। তাও যদি না পারো তাহলে তাদের মহব্বত করো, হিংসা করো না। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলে ওঠেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের জন্যও সুযোগ রেখেছেন।

দশ, হযরত আবু বকর আজরী রহ. বলেন, আলেমদের ফযীলত সর্বাবস্থায়। ঘর থেকে বের হতেই তা শুরু হয় এবং প্রতি পদে পদে হাসিল হয়। ইলমী মজলিসে বসা, মুযাকারা করা, দরস-তাদরীস সবই অতীব ফযীলতের কাজ। ইলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাজই অত্যধিক ফযীলত রাখে।

এগার, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. যখন খলিফা হন একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হলো, এখন তো মাশাআল্লাহ দেশজুড়ে বড় বড় আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস-মুফাস্সির আছেন; তাদের অবর্তমানে দেশের কী অবস্থা হবে? তাই তিনি ইলম সংরক্ষণের চিন্তা করেন এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট এ মর্মে চিঠি লেখেন। তেমনি এক চিঠি তিনি লিখেছেন ইমাম ইবনে হযমের নিকট। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাকে লেখেন-

'তুমি রাসূল সা.-এর হাদীসগুলো খুঁজে খুঁজে লিখে নাও। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আলেমদের প্রস্থানে ইলমও মিটে যাবে। শুধু রাসূল সা.-এর হাদীসগুলোই জমা করবে। পরে সেগুলো প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করবে। দীর্ঘ দীর্ঘ মজলিস কায়েম করবে যাতে মূর্খরাও শিখে নিতে পারে।[আল হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন ২৪৪]

বার. এক বুযুর্গ বলেন,
'মূর্খ বয়সী হলেও ছোট আর আলেম কম বয়সী হলেও বড়।'

এর প্রমানে এক কবি বলেন

'তোমরা বেশি বেশি পড়ো, কেননা কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না। আলেম কখনো জাহেলের সমান নয়। নেতার যদি ইলম না থাকে তাহলে সে ছোট, যখন তারা কোথাও সমবেত হয়। [আর রিহালা ফি তলাবিল হাদীস ৬]

তের, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওন বলেন,

'তিনটি জিনিস এমন যা আমি নিজের জন্য এবং আমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করি। প্রথমত হাদীস শেখা এবং শেখানো।

দ্বিতীয়ত কুরআন শেখা এবং শেখানো।

তৃতীয়ত ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করা।

চৌদ্দ, হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে মুআল্লিম হিসেবে যখন রাসূল সা. ইয়ামানে পাঠান, তখন ইলমের ফযীলত সম্পর্কে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, ইলম শেখ; কেননা যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম শেখে তার জন্য তা খোদাভীতির কারণ হয়। ইলম শেখাও ইবাদত। ইলমের তাকরার ও মুযাকারা আল্লাহর নিকট তাসবীহতুল্য। পরস্পর মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা জিহাদতুল্য। আর মূর্খকে ইলম শেখানো সদকাতুল্য। যোগ্য লোককে ইলম শেখানো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়।

কেননা এর মাধ্যমে হালাল-হারাম চেনা যায়। ইলম মানুষের একাকিত্বের বন্ধু, দুঃখ-দুর্দশায় পথপ্রদর্শক; চরিত্র সংশোধনের মাধ্যম, গরীব-দুঃখীর সঙ্গে মেশার উপায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্তবা বুলন্দ করে দেন। অবিসংবাদিত নেতা ও সমাজ সংস্কারক বানিয়ে দেন। তাদের সিদ্ধান্ত হয় সঠিক সিদ্ধান্ত। ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়। সমুদ্রের মাছ থেকে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে। মৃত আত্মার জন্য ইলম সঞ্জীবনী সুধা, অন্ধকারের আলো এবং দুর্বলের হাতিয়ার। ইলমের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতা পায়, সমাজে প্রভৃত সম্মান লাভ করে। আখেরাতে পায় উঁচু মাকাম। ভাগ্যবানরাই লাভ করে ইলমের নেয়ামত। দুর্ভাগারা বঞ্চিত হয় ইলমের নেয়ামত থেকে।[জামেয়ু বানায়িল ইলমি ৭৭]

প্রকৃত ইলম ও প্রকৃত আলেম

পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাঈলদের প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ عَلِمُو الْمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। [বাকারা: ১০২

অতপর ইরশাদ হয়েছে,

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ

তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত। প্রথমে বলা হয়েছ ولقد علموا)নিঃসন্দেহে তারা অবগত হয়েছে) এটা তাদের ওরফ অনুযায়ী বলা হয়েছে। কারণ, তারাও শুধু জানা এবং পড়াকেই ইলম বলে আখ্যায়িত করত। তারপর বলা হয়েছে لو كانوا يعلمون)যদি তারা জানতো(এটা আল্লাহ নিজের দৃষ্টিতে বলেছেন এবং এর দ্বারা তাদের আমলহীন ইলমকে নাকচ করেছেন।

বোঝা গেল, শরীয়তের পরিভাষায় আলফায (শব্দ) এবং অর্থ জানার নাম ইলম নয়। কারণ, বনী ইসরাঈলের আলেমদের কাছে তো আলফাযের ইলম বিদ্যমান ছিল। তারপরও কুরআনে তাদের ইলমের অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

মোটকথা ইলমের সাথে যখন আমলের সমন্বয় ঘটে তখনই তা ইলম বলার যোগ্য হয়।

একটি হাদীসে এসেছে,
إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا) নিঃসন্দেহে বহু ইলম এমন রয়েছে, যা মূর্খতার নামান্তর) বলা বাহুল্য, একটি জিনিস একই সঙ্গে ইলম ও মূর্খতা হতে পারে না।
তাই হাদীসের মর্ম হল, إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ
النَّاسِ لَجَهْلًا عند الله অর্থাৎ ওরফে প্রচলিত অনেক ইলম আল্লাহর দৃষ্টিতে মূর্খতা বলে গণ্য হয়ে থাকে। এ থেকে বোঝা গেল যে, কেবলমাত্র জানাজানির নাম ইলম নয়; বরং তার হাকীকত ও স্বরূপ ভিন্ন কিছু।
আর সেদিকে ইঙ্গিত করেই একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'কিছু ইলম বান্দার স্বপক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে।

সুতরাং একটি হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার যে, আমরা যারা নিজেদেরকে আলেম এবং ফকীহ মনে করি ইলম অনুযায়ী আমাদের আমল কতটুকু হচ্ছে। আমলের মাঝে ইলমের কতটুকু প্রভাব পড়েছে। আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে নিজেদের চেয়ে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করি। মঞ্চ-মাহফিলে ইলমের যেসব ফযীলত ও মাহাত্ম বর্ণনা করি তা কেবল নিজেদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই বলে থাকি। জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করি যে, আমাদের সম্মান করা উচিত। এটা বড়ই লজ্জার কথা। -[হুকুক ও ফারাইজ-৭৫)

উপকারী ইলম ও ক্ষতিকর ইলম

ইলম শিখেও যার মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় না তার চেয়ে ঐ মূর্খই উত্তম যার মাঝে খোদাভীতি রয়েছে। ইলম উপকারী ও ক্ষতিকর হওয়াকে তলোয়ারের ধারের সাথে

তুলনা করা যায়। তার আঘাতে শত্রু-মিত্র উভয়ের দেহই কাটে। তরবারি সঞ্চালনকারী আনাড়ি হলে কখনো তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে।
যেমন কেউ শত্রুকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে আঘাত করল কিন্তু সেদিকে না গিয়ে তার নিজের গায়েই এসে পড়ল। ঠিক তেমনিভাবে ইলমেরও একই অবস্থা। তা বড় স্পর্শকাতর জিনিস। তাতে নিরাপত্তা ও আশঙ্কা উভয়টিই নিহিত রয়েছে। কল্যাণের সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে।
লক্ষ্য করবেন, পৃথিবীময় যতগুলো ভ্রান্ত দল সৃষ্টি হয়েছে তা শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরই সৃষ্ট। জাহেল ও মূর্খের কথা কে শুনে? [আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৩৫২]

ইলম (জ্ঞান) এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত

১. 'ইলম নবীগণ এর উত)أنه
إرث الأنبياء
নবীগণ (কাউকে) দিরহাম এবং দিনারের (দুনিয়াবী কোন জিনিসের) উত্তরাধিকারী বানাননি। কেবলমাত্র তারা (মানুষকে) 'ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি 'ইলম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি নবীগণ এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে। অতএব এ শতাব্দীতে যখন তুমি জ্ঞানবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তুমি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরাধিকারী হবে। আর এটি ('ইলম অর্জনের) সবচেয়ে বড় ফযীলত।

২. 'ইলম স্থায়ী হয়, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়) أنه يبقى والمال يفنى(
: আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে (মাটিতে) পড়ে যেতেন। আমি আল্লাহর কসম করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমাদের যুগে মানুষের মাঝে আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছ চলে, নাকি চলে না? হ্যাঁ। তার বর্ণিত হাদীছ অনেক চলে। সুতরাং আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছাওয়াব হয়, যে ব্যক্তি তার বর্ণিত হাদীছগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। তাহলে বুঝা গেল যে, 'ইলম টিকে থাকে, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়।

অতএব, হে 'ইলম অন্বে ষণকারী! 'ইলমকে আঁকড়ে ধরা তোমার উপর অপরিহার্য। হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল (সকল আমলের ছাওয়াব তার থেকে) ছিন্ন হয়ে যায়। ছদাক্বায়ে জারিয়াহ, এমন 'ইলম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎ সন্তান, যে সন্তান (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু'আ করে"।

৩. আহলুল ইলম (আলিমগণ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সত্য দীনের উপর অটল থাকবেনঃ

মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের সঠিক 'ইলম (জ্ঞান) দান করেন"। প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহর আদেশক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ওহীর জ্ঞান) বন্টন করি এবং আল্লাহ (তার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের সকলকে দীনের 'ইলম) দান করেন। আর এ উম্মাহ (আলিম জাতি) আল্লাহর সত্য দীনের উপর অটল থাকবেন। যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) সংঘটিত হবে, (অথচ তারা এমনই থাকবে)।

৪. ইলমরে ব্যাপারে ঈর্ষা করতে উৎসাহ প্রদানঃ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "(শুধুমাত্র) দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া (অন্য কোন ক্ষেত্রে) ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তাকে মহৎ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা খরচ করার ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন,

অতঃপর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে (ছাওয়াবের আশায়) শিক্ষা দেয়"। আল্লাহ (তার বান্দাগণকে) যেগুলো নি'আমত দান করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন নি'আমতের ব্যাপারে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি।

তবে দু'টি নি'আমতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)।

ক. 'ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

খ. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

৫. 'ইলম (অন্বেষণের পথ) জান্নাতের পথ)أنه طريق الجنة(

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছ তার প্রমাণ। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর যদি কোন ব্যক্তি 'ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন।

৬. 'ইলম হচ্ছে আলো, যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়:

বান্দা জানে সে কিভাবে তার প্রতিপালকের 'ইবাদত করবে এবং সে কিভাবে তার বান্দাদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করবে। অতএব, এসব ব্যাপারে 'ইলম এবং (কুরআন ও হাদীছের) সুস্পষ্ট দলীল অনুযায়ী তার চলার পথ হয়। নিশ্চয় আলিম (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন আলো, যার দ্বারা লোকেরা তাদের দীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সঠিক পথ পায়।

আর বানী ইসরাঈলের (১০০ জন মানুষকে হত্যাকারী) লোকটির ঘটনা আমাদের অধিকাংশের নিকটে গোপনীয় নয়। যখন ঐ লোকটি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করল, তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একজন আলিম সম্পর্কে (মানুষকে) জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তাকে একজন ধার্মিক লোকের ব্যাপারে বলা হলো। তারপর সে (তার নিকটে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করল: তার জন্য কি কোন তাওবাহ রয়েছে? তখন ধার্মিক লোকটি যেন বিষয়টিকে বড় মনে করলেন। তারপর তিনি বললেন: না। (কোন তাওবা নেই)। ফলে সে তাকে হত্যা করে তার দ্বারা (হত্যাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা) ১০০ জন পূর্ণ করল। অতঃপর সে একজন আলিমের নিকটে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল: (তার জন্য কি কোন তাওবাহ রয়েছে?) তখন তিনি তাকে সংবাদ দিলেন যে, তার জন্য তাওবাহ রয়েছে। (তিনি তাকে আরও সংবাদ দিলেন যে.) এমন কিছু নেই, যা তার মাঝে এবং তার তাওবাহ'র মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। অতঃপর তিনি তাকে এক দেশের ব্যাপারে বললেন, সে দেশের উদ্দেশ্যে তার বের হওয়ার জন্য, যার অধিবাসীগণ সৎ। ফলে সে বের হলো। অতঃপর রাস্তার মাঝে তার মৃত্যু সংঘটিত হলো। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। সুতরাং 'আলিম (জ্ঞানী) এবং জাহিল (মূর্খ) এর মাঝে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

৭. নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে (আলিমগণকে) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন:

তারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের যে দায়িত্ব পালন করেন, তার ভিত্তিতে এবং তারা যা জানেন তা অনুযায়ী আমল করার ভিত্তিতে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার সমস্ত বান্দাদের মাঝে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে, পরকালেও তিনি তাদেরকে এসবের ভিত্তিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন"।

৮। ইলম হলো উত্তম জিহাদঃ জিহাদ দুই ধরনের। যথাঃ

ক. দলীয় প্রমাণ ও ইলমের মাধ্যমে জিহাদ

খ. সমরাসূত্রের মাধ্যমে জিহাদ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি চাইলে প্রত্যেকটা জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং, তুমি কাফিরদের সাহায্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।"

সুতরাং ইলমের মাধ্যমে জিহাদ সবচেয়ে বড় জিহাদ। যাকে জিহাদান কাবীরা বলে।

কুরআন-সুন্নাহর ইলম কেন কল্যাণময়

কুরআন মাজীদের একটি বিখ্যাত আয়াত-

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ

.

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যে হিকমাহ প্রাপ্ত হয়েছে সে তো প্রভুত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে। -সূরা বাকারা (২) : ২৬৯

কুরআনে কারীমের প্রতিটি ইলম, প্রতিটি বিষয় কল্যাণ। কুরআনে কারীমের যে কোনো বিষয়ের উপর আমলের তাওফীকও কল্যাণ। কুরআনে কারীমের এক একটি অংশ যে অর্জন করে সে কল্যাণের এক একটি অংশ অর্জন করে। কুরআনে কারীমের এক একটি বিধানের উপর আমলের সৌভাগ্য যে অর্জন করে, সে খাইর ও কল্যাণের এক একটি বড় অংশ অর্জন করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিখ্যাত হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

তাহলে দ্বীনের ইলম, দ্বীনের প্রজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অনেক বড় নিআমত। যাকে তিনি কল্যাণ দান করতে চান তাকে এই নিআমত দান করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। দুনিয়াতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, আখিরাতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না।

ما شاءَ الله كانَ، وما لم يشَأْ لم يكُن.

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। তো হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কল্যাণ-ইচ্ছার একটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন যে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা, দান করেন। সে দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে

পারে, দ্বীনের বিধান অনুযায়ী চলতে পারে। আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন করে।
কুরআন ও সুন্নাহয় হিকমাকে খাইর বলে অভিহিত করা হয়েছে; বরং খাইরে কাছীর প্রভৃত কল্যাণ বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল বান্দা যেন, এ 'খাইরে কাছীর' অর্জনে উৎসাহিত হয়। খাইর বলে জানবে কিন্তু তা অর্জনে সচেষ্ট হবে না- তা তো হতে পারে না। যার বিচার-বুদ্ধি আছে, কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি বিশ্বাস আছে, যে নিজের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চায়, সে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে জানবে যে, এই বিষয়টি খাইর, এটি কল্যাণ, তখন অবশ্যই তা অর্জনে সচেষ্ট হবে।
তো কুরআন ও সুন্নাহয় এই কল্যাণ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষ যেন নিজেও এই কল্যাণ অর্জন করে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এই কল্যাণের চিন্তা-ভাবনা করে।

এখানে একথাটিও বুঝতে হবে যে, কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হচ্ছে এমন কল্যাণ, যা অর্জন করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। এটা নিছক মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক পর্যায়ের বিষয় নয়। ইচ্ছে হয় অর্জন করলাম, ইচ্ছে হল না অর্জন করলাম না- এমন বিষয় নয়; বরং এটা এমন খাইর, যার বিপরীত 'শার'। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে অকল্যাণ। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে ধ্বংস। এমন কল্যাণ, যা মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ। সুতরাং এটা ঐচ্ছিক কল্যাণ নয়; বরং এমন কল্যাণ, যা অর্জন করতেই হবে।
নিজেও অর্জন করতে হবে, নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকল মুসলিমের জন্য এই কল্যাণের শুভ কামনা অন্তরে পোষণ করতে হবে।

কুরআনে কারীমের সূরাতুত তাহরীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা অতি হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে ইরশাদ করেছেন-
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.
হে ঈমানদারগণ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে।

কীসের থেকে রক্ষা করবে? ‘نَارًا’-ঐ আগুন থেকে, ঐ জাহান্নাম থেকে وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ- সেই জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ। لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ- যারা আল্লাহ তাআলার কৃত আদেশের অন্যথা করেন না। وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ- এবং তাদের যে আদেশ করা হবে তা-ই তারা করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখিরাতের সেই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। কাকে রক্ষা করার? اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ-নিজেকে রক্ষা করার এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার।

রক্ষা করার উপায় কী? প্রকৃতপক্ষে রক্ষা তো করবেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া রক্ষাকারী কেউ নেই। এখানে যে আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর- একথার মানে কী? মানে হল তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার উপায় অবলম্বন কর। নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন কর, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন কর। সেই উপায় কী?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

اعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللهِ، وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ، ومُروا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، يُنْجِيكُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারি করো, নাফরমানী থেকে বেঁচে থেকো আর পরিবার-পরিজনকেও স্মরণ রাখার আদেশ করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন।

তাফসীরে ইবনে কাছীর সহীহ বুখারীর এক দীর্ঘ ঘটনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কিছু যুবক সাহাবীকে যারা বেশ কিছু দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে ইলম অর্জন করেছেন, তাদের উপদেশ দিয়েছেন যে,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ.

পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং ওদের মধ্যে অবস্থান করো আর-

عَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُم.

তাদেরকে শেখাও এবং আদেশ কর। দুটো বাক্য, দুটো কথা। কিন্তু অনেক কথা এই দুই কথার মধ্যে আছে। عَلِّمُوْهُمْ-তাদেরকে শেখাও।

কী শেখাবে? তাদেরকে ইসলাম শেখাও, দ্বীন শেখাও। আকীদা শেখাও, আমল শেখাও। তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন কর। হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন কর। এটা হল শেখানোর পর্যায়।

এর পরের পর্যায় হল আদেশ কর। শুধু শেখানো নয়, শুধু শেখানোর দ্বারাই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং 'مُرُوْهُمْ' যা শেখানো হল সেই অনুযায়ী আমলের আদেশ কর। তাদেরকে পরিচালিত কর। তো কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম শেখা ও শেখানো, সহীহ আকীদা, সহীহ আমল শেখা ও শেখানো, হালাল-হারামের বিধান শেখা ও শেখানো এবং সেই মোতাবেক নিজের ও সংশ্লিষ্টদের পরিচালিত করার চেষ্টা করা- এটা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার এবং সংশ্লিষ্টজনদের রক্ষা করার উপায়।

এই আদেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে দান করেছেন।

কাদেরকে দান করেছেন? যারা মুমিন তাদেরকে। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করেছেন। ঈমানদাররা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ মোতাবেক চলতে হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হতে হবে। বিশ্বাস করে যে, দুনিয়াতে মানুষের কর্মের ফল আখিরাতে পেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এক দল জান্নাতী হবে, এক দল জাহান্নামী। এই বিষয়টি তারা বিশ্বাস করে। কাজেই মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা সত্যে বিশ্বাস করেছ, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আমল কর-

তাহলে মুমিনকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হয় সে আলিম হবে অথবা মুতাআল্লিম। দ্বীনের জ্ঞানী হবে, কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রজ্ঞাবান আলিম হবে অথবা কুরআন-সুন্নাহ্র ছাত্র হবে অথবা কুরআন সুন্নাহ্র ইলমের শ্রোতা হবে, মনযোগের সাথে, আন্তরিকতার সাথে গ্রহণের নিয়তে কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি-বিধান শুনতে থাকবে। এর বাইরে- চতুর্থ প্রকারের লোক, না আলেম, না ছাত্র, না কুরআন-সুন্নাহ্র কথা শুনে সেই মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে- কোনোটাই নয়; বরং চতুর্থ প্রকারের। অর্থাৎ জাহিল। এই চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছুতেই হবে না। তাহলে তো ধ্বংস হতে হবে। দুনিয়ার জীবন ধ্বংসও হবে আখিরাতের জীবনও ধ্বংস হবে।

ধ্বংস থেকে যদি বাঁচতে হয় সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী গোটা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসের পথ থেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এর উপায়, কুরআন-সুন্নাহ্র ছাত্র হওয়া। কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা। তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'খাইর' বলেছেন, এটা এমন খাইর, এমন কল্যাণ, যার বিপরীত হল শার, অনিষ্ট-অকল্যাণ-ধ্বংস। এই কল্যাণ আমাদের অর্জন করতেই হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কী শেখায়? কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের বিশ্বাস কী হবে, আমাদের চিন্তা-চেতনা কেমন হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের ইবাদত-বন্দেগী কী হবে, তার পদ্ধতি কী হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের লেন-দেন কেমন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে। উপার্জনের কোন্ পদ্ধতি হালাল, আর কোন্টি হারাম। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার কেমন হবে। আল্লাহর হক কীভাবে আদায় করা হবে, বান্দার হক কীভাবে আদায় করা হবে। আল্লাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে আর বান্দার সাথে কীভাবে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

কাজেই ভালো ও সজ্জন হতে হলে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলমের কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ উন্মুক্ত করেছেন। এই ইলমের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল অঙ্গন আলোকিত হয়। আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদত-বন্দেগী, লেন দেন, আচার-ব্যবহার সবকিছু সুন্দর হয়।

দেখুন, আকীদা, ইবাদত এই পর্যন্ত তো সহজেই বুঝে আসে। কারণ সহীহ আকীদা মানুষ জানতেই পারবে না, যদি কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম অর্জন না করে। তার সঠিক বিশ্বাস কী হবে, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস, মানুষের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিশ্বাস। মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে, এ সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস অর্জনই করতে পারবে না, যদি কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের শরণাপন্ন না হয়।

ইবাদতের বিষয়টাও বুঝে আসে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদত সঠিক পন্থায় যদি করতে হয় তাহলে আমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। নামাযের নিয়ম শিখতে হবে, যাকাতের নিয়ম শিখতে হবে, সওমের নিয়ম শিখতে হবে, হজে¦র নিয়ম শিখতে হবে।

লেন-দেন সম্পর্কেও বুঝে আসে। কোন্ মুসলিম না জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান আছে। বেচা-কেনা হালাল, রিবা হারাম। এটা সকল মুসলিম জানে। তো প্রত্যেক মুসলিম মৌলিকভাবে জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান রয়েছে। হালাল মোতাবেক চলতে হলে জানতে হবে। হারাম থেকে বাঁচতে হলে জানতে হবে।

বাকি স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ- এই পর্যায়ে এসে অনেকের ভুল হয়ে যায়। পশ্চিমা শিক্ষাদর্শনের প্রভাবে মানুষের মনে এই চেতনা অনেক সময় জাগে যে, ভালো মানুষ তো সে, যার আচার-ব্যবহার ভালো। মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলে। মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। নিজের স্বার্থের উপরে অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের কিছু ভালো স্বভাব, কিছু ভালো আচরণকেই মানুষ ভালোর মানদন্ড মনে করে এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সেই বিষয়টি হচ্ছে, যে কোনো ভালো কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা ঈমানের সাথে, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। জগতে ভালো কাজ অনেকেই করে। কিন্তু প্রথমত ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গ ভালোত্ব আসতে পারে না। এক অঙ্গনে ভালো তো আরেক অঙ্গনে ঠিক এর বিপরীত। স্ব-দেশের লোকদের জন্য ভালো কিন্তু অন্য জাতির জন্য মহা হিংস্র । এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। মানুষ সামগ্রিকভাবে সবার জন্য ভালো তখনই হয় যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত ভালো স্বভাব, ভালো আচরণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা ঈমানের সাথে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। এটা যদি না হয়, তাহলে স্বভাব-চরিত্রগত যত ভালো গুণ রয়েছে, সেগুলো দুনিয়াতে কিছু কাজে আসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতেই কিছু সুনাম-সুখ্যাতি দান করে দেন। আখেরাতে সে কোনো বিনিময় লাভ করতে পারে না।

স্বভাব ও আচরণগত ভালো কাজগুলোও তখনই প্রকৃত ভালো হয় যখন মানুষ দ্বীন-ঈমান শেখে, আল্লাহমুখিতা অর্জন করে, আল্লাহর জন্য করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ، إِذَا فَقِهُوا.

এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে আল্লাহ পাক মাটির নীচে অনেক রকমের মূল্যবান ধাতু ও মূল্যবান বস্তুর খনি তৈরি করেছেন। সোনার খনি, রুপার খনি, তেলের খনি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। সোনার খনির দাম বেশি। রুপার খনি আরেকটু কমদামী, কমদামী হলেও এটাও দামী। এরকম বিভিন্ন মানের বিভিন্ন রকম খনি মাটির নীচে আছে। এরকম মাটির উপরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিছু মানুষ দানশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অগ্রসর। গুণ ও যোগ্যতার মণি-মাণিক্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পর্যায়ের।

তো মানুষের মাঝে স্বভাবগত যেসকল ভালো গুণ আছে সেগুলো ভালো।

জাহেলি যুগে আরবে অনেক মানুষ ছিল, দানশীল। অনেক মানুষ ছিল মেহমানদার। অনেক মানুষ ছিল বীরত্বে শৌর্য-বীর্যে প্রসিদ্ধ। এরকমের বিভিন্ন গুণাবলী জাহেলী যুগেও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছিল। একেক পরিবার, এক এক গোত্র এক এক বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত ছিল।

উপরোক্ত হাদীসে যেন বলা হল, জাহেলী যুগে স্বভাব ও চারিত্রিক বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে যারা ভালো হিসেবে পরিচিত ছিল ইসলামেও তারা ভালো। ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এক শর্তে। সেই শর্ত হল- إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করবে। কুরআন-সুন্নাহ্র সহীহ ইলম অর্জন করবে এবং সে মোতাবেক তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করবে।

তাহলে জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠত্ব আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কী পার্থক্য? জাহেলী যুগে যারা ভালো ছিল, তাদের প্রাপ্তি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু সুনাম-সুখ্যাতি। তারা যেহেতু ঈমান আনেনি, ইসলাম কবুল করেনি আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই। আর ইসলামে, ইসলাম কবুল করার পরে যারা ভালো, ইসলাম কবুল করার পরে যারা শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, মেহমানদার, দানশীল, খাইরের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রগামী তাদের প্রাপ্তি হল, যেহেতু তার এই ভালো গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান মোতাবেক ব্যবহৃত হয়েছে তাই তারা

এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে দুনিয়াতেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছে, আখেরাতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সওয়াব অর্জনের উপযুক্ত হয়েছে।

তাহলে ভালো স্বভাব-আচরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ঐসময় যখন সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণায়, আল্লাহর জন্য, আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، إِذَا فَقِهُوا.

তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, আদব-আখলাকে শ্রেষ্ঠ।

এক শর্তে, সেই শর্ত কী?

إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করে।

তাহলে চিন্তা করুন, দ্বীনের ইলম, কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম কত বড় কল্যাণ। কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের মাধ্যমে মানুষের গোটা জীবন শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়। গোটা জীবন আল্লাহমুখী হয়। গোটা জীবনের সকল কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক, হালাল-হারামের বিধান মোতাবেক, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সম্পন্ন হয়।

এইজন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম হচ্ছে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ।

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

এই কল্যাণ আমাদের নিজেদেরকেও অর্জন করতে হবে, আমাদের সন্তানদেরকেও এর অধিকারী করতে হবে। একজন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিক্ষার চেয়ে, কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের চেয়ে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে পরিচালিত করার চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছুই দিতে পারেন না। এটাই বাবার পক্ষ থেকে আদরের সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার।

আমাদের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে সচেত হতে হবে। দ্বীনী ইলম অর্জন করার, সহীহ আকীদা জানার, ইবাদতের সঠিক নিয়ম জানার, সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন কারীম পড়তে শেখার, কুরআনে কারীম বুঝতে শেখার এবং কুরআনের আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা সকল শ্রেণির মানুষকেই করতে হবে। শিশু-কিশোরকেও করতে হবে, বয়স্কদেরও করতে হবে। সর্বস্তরের ইলম চর্চা ও ইলম বিস্তারের এই ধারা কীভাবে জারি হতে পারে, কীভাবে গতিশীল হতে পারে- এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে।

আমাদের কর্তব্য, আমাদের সন্তানদের একটা ভালো ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের পথে অগ্রসর করে দেওয়া। সামনের জীবনে সে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, যে পেশায় নিয়োজিত হোক- ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, যা-ই হোক না কেন, যদি তার প্রথম জীবনে শৈশবে-কৈশোরে কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলে, তা বোঝার মত যোগ্যতা হয়ে যায়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখে ফেলে- তাহলে আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ সামনের জীবনে অবশ্যই এর প্রভাব পড়বে।

আমাদের এই অঞ্চলে এই ব্যবস্থা কম। কিন্তু আপনি আরবে যান, সেখানে মসজিদে হারামে, মসজিদে নববীতেও ব্যবস্থা আছে। ওখানে এমন ব্যবস্থাও আছে যে, স্কুলের বাচ্চারা সকালে স্কুলে পড়ে, বিকালে এসে কুরআনে কারীম হিফয করে। হিফযখানায় পুরো সময় দিলে হয়তো দুই-তিন বছরে পূর্ণ হিফয হয়ে যেত। কিন্তু স্কুলের পড়ার পাশাপাশি কুরআনে কারীম হিফয করার কারণে সময় বেশি লাগছে, চার বছর পাঁচ বছর লাগছে। ওখানে ছেলেদের স্মৃতিশক্তি ভালো, ফলে আরো কম সময়ের মধ্যেও হাফেয হয়ে যাচ্ছে। স্কুলেও পড়ছে আবার কুরআনে কারীমের হাফেযও হয়ে যাচ্ছে। এরকম ব্যবস্থা আরববিশে^ আছে। আমাদের দেশেও এরকম ব্যবস্থার বিস্তার দরকার।

আমাদের এ অঞ্চলের সাধারণ চিন্তা হচ্ছে, স্কুলে দিয়েছি তো দিয়েছি। ব্যস, কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য দিকে কুরআন-সুন্নাহ শিখতে এসেছে তো

জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। দুই শিক্ষার মাঝে এমন দূরত্ব যে, একটাকে অবলম্বন করা হলে আরেকটা ছাড়তেই হবে; বরং সম্পূর্ণরূপেই ছাড়তে হবে। এই চিন্তাটা কতদূর সঠিক তা ভেবে দেখা দরকার। একটা পর্যায় পর্যন্ত সম্ভবত দুটোই একসাথে হতে পারে। একজন মুসলমান কুরআনে কারীম শিখবে, কুরআনে কারীমের হাফেয হবে, কুরআন বোঝার যোগ্যতা অর্জন করবে, দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবে এরপর পছন্দমতো কোনো পেশার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষার দিকে যাবে। এমনটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানের প্রভাবে ঐ পেশায় গিয়েও সে একজন মুসলিম হিসেবে তার জীবনকে পরিচালিত করতে পারবে। আল্লাহ পাক আমাদের বিষয়গুলো বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন

ইলমের প্রচার-প্রসারের গুরুত্ব

ইলম শেখার এক ফযীলত আর শেখানোর ভিন্ন ফযীলত। সব কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে, ইলমের উদ্দেশ্য হলো আমল করা। আবার অন্যের নিকট পৌঁছানোও ইলম অর্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন,
'আমাকে মুআল্লিম হিসেবে পাঠানো হয়েছে।'

এক. হযরত ওমর রা. বলেন, ইলম শেখো এবং শেখাও। এমনিভাবে মানুষকে ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য শেখাও। আবার যাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছ তদের প্রতি বিনয়ী হও, উদ্ধত হয়ো না।

দুই, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

'ইলম শেখ, কারণ কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না। [ইহ্ইয়াউল উলুম ২৯]

তিন, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন,
'যে নিজে ইলম শিখে কিন্তু অন্যকে শেখায় না সে ওই ব্যক্তির মত যে সম্পদ জমা করে কিন্তু তা থেকে খরচ করে না [মু'জামে তাবরানী ১/২১৩]

চার, হযরত মুয়ায জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন,
'যে ব্যক্তি কাউকে ইলম শেখায় আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব সেও পাবে, তবে আমলকারীকে তার সওয়াব কোনো অংশে কম দেয়া হবে না। [ইবনে মাজা ২৪০]

পাঁচ. হযরত ফুযাইল ইবনে গাযওয়ান বলেন,
'যোগ্য লোককে ইলম না শেখানো গোনাহ। আবার অযোগ্যকে ইলম শেখানো মূর্খতা। তোমাদের হতে হবে বিচক্ষণ ডাক্তার। ডাক্তার যেখানে সুস্থতার সম্ভাবনা দেখে ঔষধ লাগায়। [জামেয়ু বায়ানিল ইলমি] সুতরাং তোমাদেরও জানতে হবে কাকে কী পরিমাণ শেখাতে হবে।

ছয়, হযরত লোকমান হাকিম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন,
'হে বৎস, এ উদ্দেশ্যে ইলম শিখবে না যে, আলেমদের সঙ্গে বিতর্ক করবে, মূর্খদের সঙ্গে গর্ব করবে। অথবা সভা-সমাবেশে ইলম জাহের করে বেড়াবে। ইলম-চর্চায় অবহেলা করবে না, মূর্খদের সঙ্গে মিশবে না, বরং আলেমদের সঙ্গে থাকবে। কোনো দলকে আল্লাহর জিকির করতে দেখলে তাদের সঙ্গে বসবে। কারণ তুমি আলেম হলে এতে তোমার উপকার হবে। আর মূর্খ হলে কিছু শেখা হবে। তাদের ওপর রহমত নাযিল হলে তুমিও পাবে রহমতের কিছু অংশ। যারা আল্লাহর জিকির করে না তাদের সঙ্গে বসবে না। কারণ তুমি আলেম হলে মূর্খদের সংশ্রবে তোমার ইলম ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর মূর্খ হলে তোমার মূর্খতা বাড়বে। আবার তাদের ওপর কোনো শাস্তি হলে তা তোমার ওপরও নেমে আসবে।' [জামেয়ু মায়ানিল ইলমি]

সাত, হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন,

'অতিলাজুক ও অহংকারী ইলম শিখতে পারে না। [আল মাজমু]

আট, হযরত মুয়ায রা. বলেন,
'তোমরা ইলম শেখ। কেননা ইলম শেখা নেক কাজ, তা অন্বেষণ করা ইবাদত।
ইলমের মুযাকারা তাসবীহতুল্য।
ইলমী আলোচনা জিহাদতুল্য।

ইলম শেখানো সদকাতুল্য।
আর যার ইলম নেই তাকে শেখানো সদকাতুল্য। [তাযকিরাতুস সামে]

তিনি অন্যত্র বলেন,
'ইলম আসে চর্চা-অনুশীলনে আর হেলেম আসে ধৈর্য ও সহনশীলতায়। প্রকৃত ইলমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হেলেমও বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরো বলেন,

'যতদিন পর্যন্ত মানুষ সাহাবী ও তাদের পরবর্তীদের থেকে ইলম শিখ্যে তাদের অবস্থা ভালো ছিল। পরে যখন ছোটদের থেকে ইলম শিখতে শু করল তখনই ফ্যাসাদ দেখা দিল।' অনেকে বলেন,
الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ
'বড়দের সঙ্গে থাকে বরকত।

আজকাল লোকে ইন্টারনেট ঘেঁটে ইলম শেখে। পরে সে অনুযায়ী আমল শুরু করে দেয়। কারো কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন বোধ করে না। এয়ে প্রায়ই ফেতনা-ফাসাদ ছড়ায়।

ইলম অনুযায়ী আমল

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো, সে অনুযায়ী আমল করা। যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

'হে লোকসকল! তোমরা ইলম অর্জন করো। আর যা কিছু অর্জন করেছো তার ওপর আমল করো' তিনি আরো বলেন, নিজে আমল শুরু না করে অন্যকে নসিহত করবে না। ইলম শেখো তাহলে ইলমই বলে দেবে-তোমার কী করণীয়। শয়তান মানুষকে

কীভাবে ধোঁকা দেয়, আর সে ধোঁকা থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়, সবই বলে দেবে ইলম। অসূল সা.-এর আমলও ছিল এমন।

তিনি বলেন,
'আমি প্রথমে নিজেকে অসিয়্যত করি পরে অন্যদের।'

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায বলেন,
ইলম অর্জনের পরও যার মাঝে খোদাভীতি ও রোনাজারি না আসে সে ইলমের উপযুক্ত নয়।

পরে তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-
أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ
'তোমরা কি একথায় অবাক হও? তোমরা হাসো কেন? কাঁদো না কেন? [সূরা নাজম৫৯-৬০]

ইলমের সঙ্গে যদি তাকওয়া-তাহারাত না আসে বুঝতে হবে তার ইলম কোনো কাজে আসেনি।

হযরত হাসান বসরী রহ. নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে বলেন,

'প্রকৃত ইলম অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রভাব পড়ে মানুষের তাকওয়া- তাহারতে, আচরণে-উচ্চারণে, চাহনিতে ও অঙ্গসঞ্চালনে।

আমাদের আকাবিরগণ ইলম অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা আমলে পরিণত করতেন।

তিনি আরো বলেন,
'সর্বোত্তম ইলম হলো, যাতে তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং চিন্তা-ফিকির থাকে।'

ফকীহদের ব্যাপারে তিনি বলেন,

'ফকীহ বলা হয় দ্বীনের ব্যাপারে যিনি হন আলেম এবং দুনিয়ার ব্যাপারে হন যাহেদ, আর সর্বদা ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন।'

হযরত হাসান বসরী আরো বলেন,

ইলম অর্জন করতে গিয়ে যেন ইবাদতে ত্রুটি না হয়। আবার ইবাদতও এতটুকু করবে যেন তলবে ইলমে প্রভাব না পড়ে।

তিনি আরো বলেন,

'তোমার ইলমের প্রভাব যেন পড়ে তোমার ওপর। তোমার স্বভাবে যেন থাকে ধীরতা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্য। আলেমগণ কখনো অযথা কথা বলেন না। আর সাধারণ মানুষের অবস্থা হলো, এক মহূর্তে তারা এক মাসের কথা বলে ফেলে। [ইলমে নাফে]

আলেমগণ সবসময় ভেবে-চিন্তে কথা বলেন। প্রথমে ভাবেন পরে বলেন। আর মূর্খরা প্রথমে যাচ্ছেতাই বলে ফেলে, পরে পস্তায়।

হযরত জুন্নুন মিসরী রহ. বলেন,

'আগের দিনে ইলমের কারণে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমতো আর আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ বাড়তো। এখন দেখা যায় ইলম হলে দুনিয়ার আকর্ষণ বাড়ে। মানুষ আগে ইলমের পিছনে সম্পদ ব্যয় করতো, এখন ইলম দিয়ে সম্পদ উপার্জন করতে চায়। আজ অনেক আলেমকে দেখা যায় জাহেরী-বাতেনী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। [ইলমে নাফে]

হযরত আমর ইবনে হারেস বলেন,

'এক লোক তার ভাইকে লেখেন-দেখো, হেলেম হলো ইলমের লেবাস; সুতরাং ইলমকে কখনো লেবাসমুক্ত করো না'।

ইমাম আহমদ ইবনে সাঈদ দারেমী বলেন,

আমি আলী ইবনে মাদীনীকে একটি চমৎকার কথা বলতে শুনেছি। তিনি হাদীসে 'গারে হেরা' শুনিয়ে বলেন, এ হাদীস শুধু শুনে অবাক হবার জন্য নয়, বরং আমলের জন্য বলা হয়েছে।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বলেন,

'ইলমের সঙ্গে সঙ্গে হেলেম পাওয়ার চেয়ে মূল্যবান কিছু হতে পারে না। [জামেয়ু বায়ানিল ইলমি]

হযরত মাসরুক বলেন,

'কারো জন্য এতটুকু ইলম যথেষ্ট যাতে সে খোদাভীরু হতে পারে। আর জাহেল হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট নিজের ইলম নিয়ে সে গর্ব করবে।'
হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

'যারা ইলম শিখে ভুলে যায় আমার মতে তারা গোনাহের কারণে ভুলে যায়।'

প্রকৃত ইলম কীভাবে লাভ হয় ?

প্রকৃত ইলম তাকওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়।
কারণ রাসূল সা. বলেছেন,
'একজন ফকীহ শয়তানের কাছে একহাজার আবেদ থেকে বেশি ভারী। [তিরমিজি হাদীস নং ২৬৮১]

শুধু কিভাবী ইলম দিয়ে শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা করা যায় না। বরং তাকওয়ার মাধ্যমে যে ইলম লাভ হয় তার মাধ্যমে বোঝা যায় শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা।

সে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন,
'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের ইলম ও সমঝ দান করেন। নিশ্চয়ই আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দাতা। কেয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত আল্লাহর দ্বীনের ওপর কায়েম থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। [বুখারি ৭১]

সাহাবায়ে কেরাম তো লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে পারতেন না। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাদের সম্পর্কে বলেছেন, اَعْتَقُهُمْ عِلْمًا 'তারা উম্মতের মাঝে গভীর ইলমের অধিকারী।' তারা তো কোনো কিতাবাদি পড়েননি, তাহলে কীভাবে হলেন এমন গভীর ইলমের অধিকারী? আসলে রাসূল সা.-এর সোহবতের বরকতে পেয়েছেন সেই ইলম। তাকওয়ার মাধ্যমে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে রাসূল সা. দোয়া করেছেন,
' اللَّهُمَّ فَقَهْهُ فِي الدِّيْنِ
হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনী বুঝ ও সমঝ দান কর'।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন

'আমি ইমাম ওয়াকীর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি জবাবে বলেন, গোনাহ ছেড়ে দাও। কেননা ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর যা কোনো গোনাহগারকে দেয়া হয় না।'

সেটা কেমন ইলম গোনাহ যার প্রতিবন্ধক? কিতাবী ইলমের। গোনাহ প্রতিবন্ধক নয়। কাফের ফাসেকও অর্জন করতে পারে কিতাবী জন্য তো ইলম।

সুতরাং বোঝা গেলো, ইমাম শাফেয়ী রহ. কিতাবী ইলমের অভিযোগ করেননি, বরং অভিযোগ করেছেন প্রকৃত ইলমের।

ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয়?

ইলম সংরক্ষিত হয় আমলের মাধ্যমে। কথায় বলে,
اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْعَمَلُ قَيْدٌ
'ইলম হলো শিকার আর আমল হলো বেড়ি।'

তাই ইলমকে আমলের ছাঁচে ঢালা উচিত। আবার আমলও হওয়া চাই সুন্নাত মোতাবেক। সুন্নাত হলো পোষ্ট অফিসের সিলের মত। সিল ছাড়া চিঠি যেমন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে না, সুন্নাত ছাড়াও আমল গ্রহণযোগ্য হয় না।

ইলমে নাফের প্রথম আলামত

ইলমে নাফের প্রথম আলামত হলো, সেই ইলমের ওপর আমলের তৌফীক হয়।
মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. একবার ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেন,
ইলম কাকে বলে জান? একেক জন একেক রকম উত্তর দিল। হযরত ছিলেন চুপ। কেউ বলল, হযরত! আপনি বলে দিন ইলম কি? তিনি বলেন, ইলম এমন নূর যা থাকলে আমল না করে পারা যায় না, মনে শান্তি আসে না। আবার কোনো গোনাহ হয়ে গেলে অস্থির লাগে, কেঁদে কেঁদে তওবা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না। মনের অবস্থা যদি হয় এমন তাহলে বুঝবে তোমার ইলম নাফে।

দ্বিতীয় আলামত

ইলমে নাফের দ্বিতীয় আলামত হলো, তাকওয়া ও খোদাভীতি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا

'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। [সূরা ফাতির ২৮]

যে আলেমের মাঝে খোদাভীতি আছে, তিনিই প্রকৃত আলেম।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন,
'প্রকৃত আলেম হলো যার কাছে গোনাহের। ক্ষতিগুলো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গোনাহের ক্ষতি যার চোখে যত প্রতীয়মান হবে সে ততই বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে'।

ইলম কীভাবে বৃদ্ধি পায়?

ইলম দুইভাবে বৃদ্ধি পায়।

প্রথমত আমলের মাধ্যমে। যেমনটা হাদীসে এসেছে,

'জানা বিষয়ের ওপর যে আমল করে আল্লাহ পাক তাকে অজানা বিষয় জানিয়ে দেন।'

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার মাধ্যমে।

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে ইলম বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,"

[وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ]

'তাকওয়া অবলম্বন কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম দেবেন।' [সূরা বাকারা ২৮২]

সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন, পড়তেন না

সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন, পড়তেন না। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সাহাবায়ে কেরাম কখনো রাসূল সা.-এর সামনে কিতাব নিয়ে বসেননি। তিনি কখনো কাউকে কোনো কিতাব পড়াননি। বরং তারা রাসূল সা.-এর মজলিসে বসতেন। এতেই তাদের ইলম বৃদ্ধি পেত, ঈমান আমল সমৃদ্ধ হতো।

ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণের বিধান

শারঈ 'ইলম অন্বেষণ করা ফরযে কিফায়াহ। যখন কোন ব্যক্তি শারঈ 'ইলম অর্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তা সংরক্ষণ করবে; তখন অন্যদের জন্য তা অন্বেষণ করা "সুন্নাহ" হয়ে যাবে। আর কখনো কখনো শারঈ 'ইলম অন্বেষণ করা "ফরযে 'আইন" (ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় ফরয) হয়ে যায়। আর এর মূলনীতি হলো: "মানুষ যে 'ইবাদত করার ইচ্ছা করে এবং যে লেনদেন সম্পন্ন করার ইচ্ছা করে, সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন মানুষের উপর নির্ভর করে"। কেননা এ অবস্থায় তার উপর জানা আবশ্যক কিভাবে সে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য এ 'ইবাদতটি করবে এবং কিভাবে এ লেনদেনটি সম্পন্ন করবে।

এছাড়া অন্যান্য 'ইলম (অন্বেষণ করা) "ফরযে কেফায়া"। আর 'ইলম অন্বেষণকারীর জন্য স্বয়ং নিজে উপলব্ধি করা উচিত যে, 'ইলম অর্জনের সাথে সাথে "ফরযে কেফায়া" আদায়কারীর যে ছাওয়াব, সে ছাওয়াব তার অর্জিত হওয়ার জন্য সে 'ইলম অন্বেষণের মুহূর্তেই "ফরযে কেফায়াহ" আদায় করছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, 'ইলম অন্বেষণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত। বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে আমাদের এ যুগে ইসলামী সমাজে প্রকাশিত হয় ও অধিক হারে ছড়িয়ে পড়ে এমন বিদ'আতসমূহ যখন আরম্ভ হলো, 'ইল্ম ছাড়া ফাতাওয়া প্রদানের জন্য প্রত্যাশী লোকদের দ্বারা অধিক মূর্খতা আরম্ভ হলো এবং অধিকাংশ লোকের মাঝে বিতর্ক আরম্ভ হলো;

তখন এ তিনটি বিষয়ই 'ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে তরুণ সমাজকে বাধ্য করল।

সুতরাং এ কারণেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা এমন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের (আলিমগণের) নিকটে যাব, যাদের পর্যাপ্ত গবেষণার যোগ্যতা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার দীনের ব্যাপারে (সঠিক) বুঝ/জ্ঞান রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা

রয়েছে। কেননা সম্প্রতিকালে অধিকাংশ লোক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে কোন এক বিষয়ে তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করে, অথচ সে তত্ত্ব মানুষকে সংশোধন করার জন্য, শিক্ষাদানের জন্য তাদেরকে চিন্তিত করে না। আর তারা এমন এমন ফাতওয়া দেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতির জন্য মাধ্যম হয়ে যায়। যে ক্ষতির সীমারেখা আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেন না।

ইলম অন্বেষণকারীর আদব-কায়দা

একজন শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা/শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। তন্মধ্যে কিছু শিষ্টাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম আদেশ: আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতকে খাঁটি করা

এমনভাবে নিয়্যাতকে খাঁটি করতে হবে যে,
'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি (অর্জন) এবং জান্নাত (পাওয়া)।

কেননা আল্লাহ 'ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ও উৎসাহ প্রদান করে বলেন,
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك [محمد :١٩]
"(হে নবী!) আপনি এ 'ইলম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। সূরা মুহাম্মাদ; ৪৭:১৯।

কুরআনে আলিমগণের ব্যাপারে প্রশংসার বিষয়টি জ্ঞাত। আর যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ব্যাপারে বা কোন কাজের ব্যাপারে প্রশংসা করেন, তখন তা 'ইবাদত হয়। আর যদি মানুষ মর্যাদার মাধ্যম বানানোর জন্য শারঈ 'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা প্রশংসাপত্র পাওয়ার নিয়্যাত করে, তাহলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে 'ইল্মের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা যায়, যদি কোন ব্যক্তি সে 'ইল্মের দ্বারা কেবলমাত্র দুনিয়ার সামগ্রী পাওয়ার জন্যই তা শিক্ষা করে, তাহলে সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না।

(রাবী বলেন) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের ঘ্রাণ উদ্দেশ্য করেছেন" ।[সুনান আবু দাউদ হা/ ৩৬৬৪]

আর এটি কঠিন হুমকি। কিন্তু যদি ছাত্র/শিক্ষার্থী বলে, আমি দুনিয়ার প্রাচুর্যের জন্য সনদপত্র পেতে চাই না, বরং এজন্য যে, বিভিন্ন নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে সনদপত্রের কারণে একজন আলিমের মান (যোগ্যতা) সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং আমরা বলবো, যখন শিক্ষাদান বা পরিচালনা করা অথবা অন্য কিছু করার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার জন্যে কোন ব্যক্তির নিয়্যাত হবে সনদপত্র পাওয়া, তখন এটি হবে খাঁটি নিয়্যাত।

কোনকিছু এর ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা এটি প্রকৃত নিয়্যাত। আর প্রকৃতপক্ষে, আমি একজন শিক্ষার্থীর (জন্য অপরিহার্য) শিষ্টাচারগুলোর প্রথমেই 'ইল্লাছ' কে উল্লেখ করলাম। কেননা 'ইল্লাহ্' হলো মূলভিত্তি।

সুতরাং 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলার নিয়্যাত করা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।

কেননা আল্লাহ তা'আলা 'ইলম অর্জনের ব্যাপারে আদেশ করে বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَغفر لذنبك]محمد :١٩[

(হে নাবী!) আপনি এ 'ইলম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯।

সুতরাং যদি তুমি 'ইলম অর্জন কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি আল্লাহর আদেশ মান্যকারী হবে।

দ্বিতীয় আদেশ: নিজের এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করা

'ইলম অন্বেষণের দ্বারা নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা/মূর্খতা দূর হওয়ার নিয়্যাত করা।

কেননা মানুষের মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা।

আর এর দলীল হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলার বাণী,
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন, এমন অবস্থায় তোমরা কিছুই জানতে না! আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। সূরা আন-নাহল ১৬:৭৮।

আর বাস্তবতা এরই সাক্ষ্য দেয়।
সুতরাং তুমি 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো এবং এর দ্বারা আল্লাহভীতি অর্জনের নিয়্যাত করো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
"কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করে"। সূরা ফাতির ৩৫:২৮।

অতএব তুমি তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। কেননা তোমার মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা/মূর্খতা।
সুতরাং যখন তুমি 'ইলম অর্জন করবে এবং আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তোমার থেকে অজ্ঞতা বিতাড়িত হবে।
অনুরূপভাবে উম্মাহর (জাতির) নিকট থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। আর এটি (সম্ভব) হবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ('ইলম) শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, যেন তোমার 'ইলম দ্বারা তুমি লোকজনের উপকার করতে পার।

তৃতীয় আদেশ: শরী'আত (ইসলামী বিধি-বিধান) রক্ষা করা

'ইল্ম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শরী'আত রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা (ইসলামী) গ্রন্থাবলী শরী'আত রক্ষা করতে সক্ষম নয়। আর শরী'আতের ধারকবাহক ছাড়া শরী'আত কেউ রক্ষা করতে পারে না।

সুতরাং যদি বিদ'আতপন্থীদের মধ্য থেকে কোন লোক (ইসলামী) বিধি-বিধান সংবলিত গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ কোন পাঠাগারে আসে, যেখানে সেসব গ্রন্থাবলী গণনা করে শেষ করা যায় না। তারপর কোন বিদ'আত নিয়ে কথা বলে ও তা সাবস্ত করে, তাহলে আমি মনে করি না যে, একটি কিতাব হলেও তার জবাব দিবে। কিন্তু সে যখন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নিকটে তার বিদ'আত নিয়ে কথা বলবে তা সাব্যস্থ করার জন্য, তখন নিশ্চয় ঐ 'ইল্ম অন্বেষণকারী তার জবাব দিবে এবং আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ দ্বারা তা খণ্ডন করবে।

অতএব, একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক হলো 'ইলম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শরী'আহ রক্ষা করার নিয়্যাত করা।
কেননা পূর্ণ অস্ত্রের ন্যায় শরী'আতের ধারক-বাহকের মাধ্যম ব্যতীত (ইসলামী) শরী'আত রক্ষা করা যায় না। যদি আমাদের নিকটে অনেক অস্ত্র থাকে, তাহলে অস্ত্রের ভান্ডার পূর্ন হয়ে যাবে।

চতুর্থ আদেশ: মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্তর প্রসারিত করা)

এমন মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর প্রসারিত হওয়া/উদার হওয়া, যার উৎস হলো ইজ্জতিহাদ। কেননা আলিমগণের মাঝে মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো হয় এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই এবং মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট; তখন কেউ মাসআলাগুলোর মতভেদের ব্যাপারে ওযর গ্রহণ করবে না। অথবা মাসআলাগুলো এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলোর ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এই মাসআলাগুলোর ব্যাপারে যারা মতভেদ করেছেন, তারা এগুলোর ক্ষেত্রে ওযর গ্রহণ করেন। আর তোমার উক্তি

তার বিরুদ্ধে দলীল হবে না, যিনি মাসআলার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। কেননা আমরা যদি এটি গ্রহণ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা এর বিপরীতে বলব, তার উক্তি তোমার বিরুদ্ধে দলীল। আর যে ক্ষেত্রে নিজস্ব রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে মানুষ মতভেদ পোষণ করে, সে ক্ষেত্রে আমি এটিই চাই। পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি 'আক্বীদার মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সালাফগণের পদ্ধতির বিরোধিতা করে, তাহলে সালাফে স্বলিহীন যে পদ্ধতির উপর রয়েছেন, সে পদ্ধতির বিরোধিতা কারও পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে (নিজস্ব) রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে, সে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে অন্যদের ব্যাপারে কটূক্তি করা উচিত নয়। অথবা মতভেদের কারণে শত্রুতার এবং হিংসার পথ গ্রহণ করা উচিত নয়।

ছাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম অনেক বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাদের মতভেদের ব্যাপারে অবগত হতে চায়, সে ব্যক্তি যেন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছারগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে (অর্থাৎ লক্ষ্য করে)।

তাহলে সে ব্যক্তি অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখতে পাবে।

সম্প্রতিকালে মতভেদের কারণে মানুষ অভ্যাসগতভাবে যে মাসআলাহ গ্রহণ করেছে, এটিই সবচেয়ে বড় মাসআলাহ।

এমনকি মানুষ এখান থেকেই এমনভাবে দলবদ্ধতা গ্রহণ করেছে যে, তারা বলে: আমরা অমুকের সাথে আছি (অর্থাৎ আমরা অমুক দলের)। একটি মাসআলাহ নির্দিষ্ট দলের মাসআলাহ হয়ে যায়। আর এটি ভুল।

সুতরাং যারা তাদের নিজেদেরকে বিভিন্ন দলে নিয়োজিত করে এবং বিভিন্ন দলে দলভুক্ত হয়, এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। কেননা আল্লাহর দল একটিই।

আর আমরা মনে করি যে, বুঝের ভিন্নতা মানুষের একে অপরকে ঘৃণা করাকে এবং তাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করবে, এটিকে অপরিহার্য করে না।

অতএব, সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য হলো পরস্পর ভাই হয়ে যাওয়া। এমনকি যদিও তারা কিছু শাখাগত মাসআলাহর ক্ষেত্রে মতভেদ করে। আর প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব হলো একে অপরকে এমন বিতর্কে আহ্বান করা, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় এবং 'ইলম বিস্তৃত হয়। আর এর মাধ্যমে ভালোবাসা/বন্ধুত্ব অর্জিত

হয় এবং ভুল-ভ্রান্তি ও এমন কঠোরতা দূর হয়ে যায়, যা কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কখনো কখনো তাদের মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। আর কোন সন্দেহ নেই যে, এতে মুসলিমদের শত্রুরা খুশি হয়। আর (মুসলিম) উম্মাহর মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصابرين

"আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না, (যদি কর) তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি দূর হয়ে যাবে। অতএব, তোমরা (শত্রুদের মুকাবেলায়) ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহর (সাহায্য) ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে"। সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬।

ছাহাবাহগণ এ ধরনের মাসআলায় মতানৈক্য করতেন। কিন্তু তারা এক হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ভালোবাসা ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।

বরং আমি সুস্পষ্টভাবে বলব,

"যখন কোনো ব্যক্তি তার নিকটে বিদ্যমান দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতানৈক্য করে, তখন বাস্তবে সে ব্যক্তি তোমার সাথে একমত হয়। কেননা বাস্তবিকভাবে তোমাদের দু'জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই ('ইল্ম) অন্বেষণকারী।"

তাই, উদ্দেশ্য একটিই। আর তা হলো দলীলের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া। অতএব, যতক্ষণ তুমি দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি তোমার সাথে মতানৈক্য করবে না। কেবলমাত্র সে ব্যক্তি তার নিকটে বিদ্যমান দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতানৈক্য করে। তাহলে মতবিরোধ কোথায়? আর এই পদ্ধতিতেই (মুসলিম) উম্মাহ এক থাকে। যদিও মুসলিম উম্মাহর নিকট বিদ্যমান দলীল প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে কিছু মাসআলাহর ক্ষেত্রে তারা মতানৈক্য করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর পরস্পর বিরোধিতা করে ও অহংকার করে, তাহলে নিঃসন্দেহে পারস্পারিক বিরোধিতার পর তার সাথে উপযুক্ত আচরণ করা অপরিহার্য।

পঞ্চম আদেশ: 'ইলম অনুযায়ী আমল করা

একজন শিক্ষার্থী 'আক্বীদা, ইবাদত, চরিত্র, শিষ্টাচার এবং মু'আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে তার 'ইলম অনুযায়ী আমল করবে। কেননা আমলই 'ইলমের প্রতিফল ও ফলাফল। আর 'ইল্মের অধিকারী ব্যক্তি অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির ন্যায়। হয় এটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাবে অথবা বিপক্ষে যাবে।
আর এ কারণেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,
القرآن حجة لَكَ أَو عَلَيْكَ
"আল-কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হবে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে"।[১৭]

যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল কর, তাহলে তা তোমার পক্ষে দলীল হবে। আর যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল না কর, তাহলে তা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে।
অনুরূপভাবে আমল হবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী হাদীছগুলোকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং (ইসলামী) বিধানাবলী মেনে চলার মাধ্যমে। যখন আল্লাহ ও তার রসূল থেকে কোন সংবাদ আসবে, তখন তা স্বীকার করো এবং গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তা আঁকড়ে ধরো। আর (এ কথা) বলো না কেন? এবং কিভাবে? এটি কাফিরদের পন্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
"যখন আল্লাহ এবং তার রসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ এবং কোন মুমিনাহ নারীর তাদের সেই বিষয়ে কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। আর যদি কেউ আল্লাহ এবং তার রসূলের অবাধ্য হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে"। সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৬।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবাগণের নিকট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সে বিষয়গুলো বিস্ময়কর হতো এবং ছাহাবাগণের "বুঝ”

থেকে দূরবর্তী হতো। কিন্তু তারা তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতেন। তারা বলতেন না, কেন? এবং কিভাবে?

এটি এই উম্মাহর পরবর্তী লোকেরা যে মতের উপর রয়েছে তার বিপরীত। (এই উম্মাহর) পরবর্তী লোকদের মধ্য থেকে আমরা কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়, হাদীছ সম্পর্কে যার বোধশক্তি কম। যখন তার নিকট রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তখন তাকে আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর বিরুদ্ধে এমন কিছু কথা উল্লেখ করতে দেখতে পায়, যে কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সে ব্যক্তি প্রতিবাদ করার ইচ্ছা করে, সঠিক পথ পাওয়ার ইচ্ছা করে না। আর এই কারণেই তার মাঝে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

এমনকি সে ব্যক্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা সে ব্যক্তি হাদীছটি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেনি এবং মেনে নেয়নি।

উদাহরণস্বরুপ

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

"আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর বলেন, কে আমাকে ডাকবে, তার ডাকে আমি সাড়া দিব? কে আমার নিকট (কিছু) চাইবে, আমি তাকে (তা) দান করব? কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব? ১৮।

এই হাদীছ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন।

এটি প্রসিদ্ধ হাদীছ। বরং এটি মুতাওয়াতির হাদীছ। আর ছাহাবাগণের মধ্য থেকে কেউ তার জবান উঁচু করেননি এ কথা বলার জন্য যে, হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আল্লাহ অবতরণ করেন? আর তার থেকে কি 'আরশ খালি হয়ে যায়, নাকি 'আরশ খালি হয়ে যায় না? এবং এর সাথে যে প্রশ্নগুলো সাদৃশ্য রাখে (সেগুলো প্রশ্নও করেননি)।

অতএব, আমাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তার সম্পর্কে এবং তার রাসূল সম্পর্কে অদৃশ্যের যে বিষয়গুলোর সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো আমাদের দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া এবং আমাদের স্মরণশক্তিতে যে অনুভবযোগ্য ও সুস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, তার কারণে সেগুলোর বিরোধিতা না করা। কেননা অদৃশ্যের বিষয় অনুভূতি এবং সুস্পষ্টতার ঊর্ধ্বতম বিষয়।

আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তার রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপারে 'আক্বীদা ভিত্তিশীল হওয়া অপরিহার্য এবং মানুষের এটি জানা অপরিহার্য যে, 'আক্বীদার ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। আমি বলব না 'আক্বীদার ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য কোন প্রবেশস্থল নেই। কেবলমাত্র আমি বলব 'আক্বীদার ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহর পূর্ণতার ক্ষেত্রে যে দলীলগুলো বর্ণিত হয়েছে, বিবেক (শুধুমাত্র) সেগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও আল্লাহর জন্য যে পরিপূর্ণতা অপরিহার্য, বিবেক তার বিস্তারিত বর্ণনা বুঝতে পারে না। কিন্তু এটি বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ তার নিজের জন্য প্রত্যেক পরিপূর্ণ গুণ প্রমাণিত করেছেন। 'আক্বীদার দিক থেকে আল্লাহ প্রদত্ত এই 'ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে ইবাদতের দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত করা অপরিহার্য। যেমন আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে যে,

ইবাদত দু'টি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল।

ক. আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া।

খ. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অনুযায়ী মানুষ তার ইবাদত প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহর দীনের মাঝে মানুষ বিদ'আত সৃষ্টি করবে না, যা ইবাদতের মূল ভিত্তির ক্ষেত্রে এবং ইবাদতের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই কারণে আমরা বলব: ইবাদতের অস্তিত্ব, স্থান, সময়, নিয়মনীতি, পরিমাণ এবং ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদতটি শরী'আত (ইসলামী বিধি-বিধান) দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

ষষ্ঠ আদেশ: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া

একজন শিক্ষার্থী তার 'ইল্ম অনুযায়ী (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (দাঈ) হবে। সে প্রতিটি সুযোগেই মসজিদে, বিভিন্ন মজলিসে এবং হাটে- বাজারে (দীনের) দাওয়াত দিবে। আল্লাহ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওয়াত এবং রিসালাত প্রদানের পরে তিনি তার বাড়িতে বসে থাকতেন না। বরং প্রতিটি সুযোগেই তিনি লোকদেরকে (দীনের) দাওয়াত দিতেন এবং পদক্ষেপ দিতেন। আর আমি সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে এটি চাই না যে, তারা কিতাবসমূহের প্রতিলিপি হবে। বরং আমি তাদের পক্ষ থেকে এটি চাই যে, তারা কর্মঠ আলিম হবে।

সপ্তম আদেশ: প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা

একজন শিক্ষার্থী প্রজ্ঞার সাজে সজ্জিত হবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,
يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فَقَدْ أُوتِي خيرا كثيرا
"তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়"। সূরা আল-বাক্বরা ২:২৬৯।

যে চরিত্রের দ্বারা চরিত্রবান হওয়া যায়, তা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী অন্যের শিক্ষক হবে। যেন সে প্রত্যেক মানুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী (দীনের পথে) আহ্বান করতে পারে। আর যখন আমরা এই পথে চলব, তখন আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ অর্জিত হবে। যেমন আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ তা'আলা) বলেন,

وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا
"আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়।" সূরা আল- বাক্বরা ২:২৬৯।

আর হাকীম এর পরিচয়:

"হাকীম হলেন তিনি, যিনি বিভিন্ন জিনিসকে সেগুলোর নিজ নিজ অবস্থানে নামিয়ে দেন।"

কেননা "হাকীম" শব্দটি الاحكام মাছুদার থেকে গৃহীত এবং তার অর্থ হলো: দক্ষতা। আর কোনকিছুর দক্ষতা হলো: তাকে তার অবস্থানে নামিয়ে দেওয়া।
অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য উচিত হলো, বরং অপরিহার্য হলো সে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে হাকীম/প্রজ্ঞাবান হবে।

আর আল্লাহ তার বাণীতে দাওয়াত প্রদানের স্তরসমূহ উল্লেখ করেছেন।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"(হে রসূল!) আপনি (মানুষকে) আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমাহ/প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক করুন।" সূরা আন-নাহল; ১৬:১২৫।

আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) দের সাথে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে ৪র্থ স্তর উল্লেখ করে বলেন,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
"তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) দের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক করো। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা সীমালঙ্ঘন করে (তাদের সাথে কোন বিতর্ক নেই)।" সূরা আল-'আনকাবূত ২৯:৪৬।

অতএব, একজন শিক্ষার্থী দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে গ্রহণীয়তার অধিক নিকটবর্তী পদ্ধতিকে বেছে নিবে।
আর এর দৃষ্টান্ত নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত প্রদানের মধ্যেই রয়েছে।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান হিকমার (প্রজ্ঞার) সাথে হওয়া অপরিহার্য; যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

অষ্টম আদেশ: 'ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর ধৈর্যশীল হওয়া

একজন ছাত্র 'ইল্ম অর্জন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং বিরক্ত হবে না। বরং সক্ষমতা অনুযায়ী 'ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে অটল থাকবে। আর সে যেন 'ইল অজনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং বিরক্ত না হয়। কেননা যখন কোন লোক বিরক্ত হয়, তখন সে লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন সে 'ইল্ম অজনের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী হবে, তখন সে একদিক থেকে ধৈর্যশীলগণের মত ছাওয়াব পাবে, অপরদিক থেকে ভাল ফল হবে। অতএব,

তুমি আল্লাহর বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, যা তার নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"এটি অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার নিকটে প্রত্যাদেশ পাঠাচ্ছি, যা এর পূর্বে আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় জানত না। অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য"। সূরা হুদ ১১:৪৯।

নবম আদেশ: 'আলিমগণকে সম্মান এবং মূল্যায়ন করা

নিশ্চয় 'আলিমগণকে সম্মান করা এবং মূল্যায়ন করা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। 'আলিমগণ এবং সাধারণ জনগণের মাঝে যে মতানৈক্য হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অন্তর প্রসারিত হওয়া আবশ্যিক। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা কিছু লোক অন্যদের ভুলগুলোর অনুসরণ করে, যেন ভুলগুলো থেকে এমন কিছু গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। আর মানুষের সাথে গণ্ডগোল করে। এটি সবচেয়ে বড় ভুলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন একজন সাধারণ মানুষের 'গিবত করা কাবীরাহ (বড়) গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তখন একজন 'আলিমের 'গিবত করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। একজন 'আলিমের

বিরুদ্ধে অপর একজন 'আলিমের 'গিবত করার ক্ষতি কম নয়। আর মানুষ যখন কোন 'আলিমের ব্যাপারে উদাসীন হয় অথবা কোন 'আলিম মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যান, তখন তার বাণী ও বাতিল হয়ে যায়। আর যখন কোন 'আলিম হক্ক কথা বলেন এবং হক্কের দিকে দাওয়াত দেন, তখন এই 'আলিমের ব্যাপারে কোন লোকের 'গিবত মানুষের মাঝে এবং তার শারঈ 'ইল্মের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ভয়াবহতা অনেক বড় এবং কঠিন।

দশম আদেশ: কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

'ইল্ম অর্জনের ব্যাপারে এবং এমন কিছু মূলনীতি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে পূর্ণ আকাঙ্খা থাকা সকল শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক।
যদি একজন শিক্ষার্থী সেসব মূলনীতি দ্বারা আরম্ভ না করে, তাহলে তার কোনই সফলতা নেই। আর সে মূলনীতিগুলো হচ্ছে:

ক. আল-কুরআনুল কারীম)القرآن الكريم(

(কুরআন) তিলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, বুঝা এবং এর প্রতি আমল করার দিক দিয়ে এর সাথে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। কেননা আল- কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি, সকল জ্ঞানের মূলভিত্তি।

খ. ছ্বহীহ সুন্নাহ)السنة الصحيحة

এটি ইসলামী শরী'আতের দু'টি উৎসের দ্বিতীয়তম (উৎস)।
আর এটি আল- কুরআনুল কারীমকে ব্যাখ্যা করে।
সুতরাং আল-কুরআনুলকারীম এবং ছহীহ সুন্নাহর মাঝে সমন্বয় করা, এ দু'টির সাথে আঁকড়ে থাকা এবং সুন্নাহ সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। হয় মূল হাদীছগুলো মুখস্থ করার মাধ্যমে অথবা হাদীছগুলোর সানাদ ও মতন (মূলভাষ্য) সম্পর্কে গবেষণা করার মাধ্যমে এবং য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ থেকে ছহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীছকে পৃথক করার মাধ্যমে (সুন্নাহকে সংরক্ষণ করবে)। অনুরূপভাবে সুন্নাহর পক্ষ

সমর্থন করার মাধ্যমে এবং সুন্নাহর ক্ষেত্রে বিদ'আতপন্থীদের সংশয়গুলোর জওয়াব দেওয়ার মাধ্যমেও সুন্নাহর সংরক্ষণ হয়।

সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক আল- কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা।

গ. আলিমগণের বক্তব্য

এটি তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব আলিমগণের বক্তব্যকে অবহেলা এবং উপেক্ষা না করা। কেননা আলিমগণ 'ইল্মের ক্ষেত্রে দক্ষতার দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী।

এজন্য আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আলিমগণের বক্তব্যের সাহায্য নেওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক।

একাদশ আদেশ: বিভিন্ন সংবাদ এবং বিভিন্ন বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া

যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচারসমূহ দ্বারা সজ্জিত হওয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি শিষ্টাচার হলো; বর্ণিত সংবাদসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রকাশিত বিধানসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।
অতএব, যখন সংবাদগুলো বর্ণিত হবে: তখন প্রথমত এগুলোর ব্যাপারে এটি নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য যে, যার নিকটে উক্ত সংবাদগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো ছহীহ নাকি ছহীহ না? অতপর যখন সংবাদগুলো ছহীহ হবে, তখন সংবাদগুলো বিধানে সাব্যস্ত হবে।

সারাংশ হলো যে: যখন কোনো ব্যক্তির থেকে কোনো সংবাদ বর্ণিত হবে, যা ভুল মনে করা হয় ; তখন ধারাবাহিক তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে
(১) সংবাদটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিশ্চত হওয়া।

(২) বিধানটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা।

অতএব, বিধানটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে তার পক্ষ অবলম্বন করা। আর যদি বিধানটিকে ভুল মনে করা হয়
তাহলে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে হবপ ।
(৩) যার দিকে বর্ণনাটিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার নিকটে সে বর্ণনার ব্যাপারে বিতর্ক করার জন্য যাওয়া। আর এই বিতর্কটি যেন শান্তভাবে এবং সম্মানের সাথে হয়।

দ্বাদশ আদেশ: আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

'ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য বুঝা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অধিকাংশ মানুষকে 'ইল্ম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে (সঠিক) বুঝ দেওয়া হয় নি। (অতএব) বুঝা ছাড়া আল্লাহর কুরআন এবং রসূলুল্লাহ জ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে যা সহজ, তা তোমার মুখস্ত করা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা উদ্দেশ্য করেছেন, তা আল্লাহ এবং তার রসূল থেকেই তোমার বুঝা আবশ্যক। কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে কতইনা ভুল সংঘটিত হয়! যে দলের লোকজন আল্লাহ এবং তার রসূলের উদ্দেশ্য ছাড়াই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে। এর ফলে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হয়। আর এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছি। জেনে নাও! তা হলো- বুঝার ক্ষেত্রে যে ভুল হয়, তা কখনো কখনো অজ্ঞতার ভুলের চেয়ে কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। কেননা অজ্ঞ ব্যাক্তি যখন তার না জানার কারণে তখন সে জানে যে, সে জাহেল। ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু 2 যখন ভুল করে, তখন সে নিজে নিজে এই বিশ্বাস করে যে, সে এ আলিম এবং সে এটাও বিশ্বাস করে যে, এটিই আল্লাহ এবং তার উদ্দেশ্য।

ইলম অর্জনের সুনির্দিষ্ট কারণ

'ইলম অর্জনের অনেক কারণ বিদ্যমান। সেগুলোর কিছু উল্লেখ করা হলো

১. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা

তাক্বওয়া অর্জন করা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
و لَقَدْ وَصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و إياكم أن اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا
"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই আমি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমারা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি তোমরা কুফুরী কর তাহলে, নিশ্চয় আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত"। সূরা আন-নিসা ৪:১৩১

২. 'ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রমী হওয়া ও তাতে অটল থাকা

'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রম ব্যয় করা, তার উপর ধৈর্যধারণ করা এবং 'ইলম অর্জনের পর তা সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক।
কেননা শরীরের প্রশান্তির মাধ্যমে 'ইলম অর্জিত হয় না। অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঐ সকল পথে চলবে, যে সকল পথ 'ইলম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর একারণে সে ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

কেননা ছহীহ মুসলিমে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,
من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سَهْلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
"যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো পথে চলে, যে পথে সে 'ইলম অন্বেষণ করবে; তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সহজ করে দিবেন"।[সহিহ মুসলিম ২৬৯৯]

অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অধ্যবসায়ী হয়, কঠোর পরিশ্রমী হয়, রাত্রী জাগরণ করে এবং তার থেকে যেন ঐ প্রত্যেক জিনিস দূরে থাকে, যা তাকে 'ইলম অন্বেষণ থেকে বিরত রাখে অথবা তাকে ব্যস্ত রাখে।

৩. হিফয বা মুখস্থকরণ

পড়াশুনার ব্যাপারে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। আর সে যা শিক্ষা করে, তা তার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং তা তার কিতাবে সংরক্ষণ করা তার উপর আবশ্যক। কেননা মানুষ ভুলের লক্ষ্যবস্তু। অতএব, যখন মানুষ পড়াশুনার ব্যাপারে লেগে থাকবে না এবং যা শিখেছে তা বারবার চর্চা করবে না, তখন অবশ্যই এটি তার থেকে হারিয়ে যাবে এবং তা সে ভুলে যাবে। বলা হয়ে থাকে: 'ইলম হচ্ছে শিকারলব্ধ প্রাণী এবং তা লিখে রাখা হচ্ছে প্রাণীটির বন্দিকরণ।
যে সকল পদ্ধতি 'ইলম সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে, তার মধ্য থেকে একটি পদ্ধতি হলো, 'ইল্ম অনুযায়ী মানুষের সঠিক পথ পাওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَ الَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدًى وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, তিনি তাদের সঠিকপথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীতি প্রদান করেন। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭।

অতএব, যখনই মানুষ তার 'ইল্ম অনুযায়ী আমল করে, তখনই আল্লাহ তার মুখস্ত শক্তি এবং "বুঝ" শক্তি বৃদ্ধি করে দেন।

৪. আলিমগণের সংস্পর্শে থাকা)

আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। অতঃপর আলিমগণের সংস্পর্শে থাকা এবং তাদের কিতাবে তারা যা লিখেছেন তার সাহায্য নেওয়া একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلم

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-
ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়।

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া।
ইরশাদ হয়েছে-

فسلوا أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন

আহলে ইলম বলেন,
ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে।

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।
এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে।
বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।

ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন
অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে।

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।
একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল।
তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল।

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন।

আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন,
আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি।

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত।

ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী।

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায় অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না।

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মুসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-
شهد الله أنه لا اله الا هو
والمليكة و أولوا العلم قايما بالقسط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও 'উলুল ইলম'ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, 'উলুল ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য- جَمِيعِ عِلْمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
মুমিনদের আলেমগণ। ইমাম কালবীও এমনটি বলেন।

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ, সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে

গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ।

তখন নবীজী ইরশাদ করলেন- আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতওযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়।

আরো ইরশাদ করেন-

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল।

হযরত আনাস রা. বলেন,
রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)।
তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললেন- لعلك ترزق به
সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ।

* হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন

কেউ কেউ এই হাদীসের - "أجنحتها لتضع" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।'

মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনী ইলম অর্জনের তাওফীক দিন।

ইলম অর্জনের মর্যাদা

ইলম অর্জনের মর্যাদা অত্যধিক।
এ সম্পর্কে আল্লাহ বলে
وَالَّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ الله يرفع خبير تعملون بِمَا وَالله درجات العلم أُوتُوا
'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত'।

ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।

অন্য হাদীছে এসেছে,

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হল। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তার প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং তার ফেরেশতামন্ডলী, আসমান- যমীনের অধিবাসী, পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং এমনকি মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু'চক্ষু আমি অন্ধ করেছি তার বদলে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম

অন্যত্র রাসুল (ছাঃ) বলেন

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকরীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহর নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো'আ করে)'।

১. ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে:

সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ. কে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করো নি? এতে তিনি ইলম হাসিলের পর আমলের কথা বলেছেন।

ইরশাদ হয়েছে

: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنة وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ١٩)

[محمد : ١٩]

'অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

এ আয়াতে আগে ইলম তথা জানার কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে আমলের (ক্ষমা চাওয়ার) কথা। এই আয়াতকে সামনে রেখে

ইমাম বুখারী রহ, তদীয় সহীহ গ্রন্থের একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এমন শিরোনামে এ অধ্যায়

'বলা ও করার আগে শেখা সম্পর্কে'।

অতএব কথা ও কর্মের আগে ইলম অর্জনের অগ্রাধিকার। কারণ ইলম ছাড়া কোনো আমল শুদ্ধ হয় না। আর প্রথমেই শিখতে হবে তাওহীদ তথা আল্লাহর নিরজুশ একাত্ববাদের ইলম। একে বলা হয় সুলুকের ইলম। যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়। আকীদা শুদ্ধ করা যায়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়।

২. ইলম দৃষ্টির আলো:

ইলম দৃষ্টির আলো। যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে। তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয়। এ হলো অন্তরের দৃষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبَ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الأنصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ٤٦] (الحج :٤٦]

'তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে নি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন আলেম ও অন্ধ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أنزل إليك من رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هو أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَٰبِ ١٩
[الرعد :١٩])

যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

৩. ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহ ভয় সৃষ্টি করে:

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلموا إن الله عزيز غَفُورٌ ٢٨] (فاطر :٢٨[

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
إن الذين أوتوا العلم من قبلة إذا يتلى عليهم يدرون للأذقان سجدًا ١٠٧ وَيَقُولُونَ سَبحن ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ١٠٨ وَيَخرون للأدقان يبكون ويزيدهُمْ خُسُوعًا ١٠٩ (الاسراء: ١٠٧، ١٠٩]

'নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব। আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

৪. ইলম বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা:

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। ইলমের মর্যাদা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
( ]١١٤: طه) [١١٤ وقل رب زدني علما

'এবং তুমি বল, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকত তবে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা-ই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন। যেমন তিনি এ আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

৫. ইলম উত্তম জিহাদ:

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে জিহাদ করা। এটিই নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। কারণ ইলম অর্জনে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রুও বেশি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
(ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ٥١ فلا تطع الكفرين وجهدهم به جهادًا كبيرا ٥٢
[الفرقان :٥١ ٥٢]
'আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।'

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। একে মুনাফিকদের বিরুদ্ধের জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না।

তারা বরং দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত। কখনো তারা মুসলিমের সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই শরিক হত।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

:يأيها النبي جهد الْكُفَّارَ وَالْمُتفقين وأغلظ عليهم ومأويهم جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ٩] (التحريم
]

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও। আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।' আর বলাবাহুল্য, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ, ইলম অর্জন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান- সবগুলোই সাবিলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা।"

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখাবার অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে।

৬. ইলম প্রচারে প্রতিযোগিতা:

আল্লাহ তা'আলা কেবল দু'টি বিষয়ে পরস্পর হিংসা (ঈর্ষা) পোষণ বৈধ রেখেছেন সম্পদ ব্যয় এবং ইলম ব্যয়। এটি করা হয়েছে এ দুই জিনিসের মর্যাদা হেতু। আর মানুষকে নানা ধরনের কল্যাণ আহরণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'কেবল দুই ব্যক্তিকে হিংসা করার অনুমতি রয়েছে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। অতপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ওই ব্যক্তি যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন। ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তার শিক্ষা দেয়

৭. ইলম ও দীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য আল্লাহর মহাদান:

আল্লাহ যাকে দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেন তিনিই প্রকৃত তাওফীকপ্রাপ্ত। কেননা দীনী বিষয়ে প্রাজ্ঞতা ও পাণ্ডিতা আল্লাহর এক মহাদান।
মু'আবিয়া ইবন সুফিয়ান রাদিআল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,-

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তিনি তাকে দীন বিষয়ে গভীর ইলম দান করেন।

৮. ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশি:

ইবাদতের চেয়ে ইলমের গুরুত্ব বেশি। কারণ, ইলমের মর্যাদার হেতুগুলো একটি হলো তা ইবাদতের প্রতি ধাবিত করে। আর যে ইলম হাসিলে পথ অতিক্রম করে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায়। মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'আল্লাহ আমার প্রতি ওহী করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে কোনো রাস্তা অবলম্বন করে, আমি তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেই। আর আমি যার দুই প্রিয়তমকে (চক্ষুদ্বয়) কেড়ে নেই, এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি।
কল্যাণের ইলম আহরণে আধিক্য ইবাদতেও আধিক্যের হেতু।
দীনের সেরা বিষয় হলো আল্লাহর ভয়।'

আলেমদের মর্যাদা

১. আলেমরাই বিশ্বস্ত:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

و شهد الله أنه لا إله إلا هو والملكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ١٨) [آل عمران :١٨]

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

এ থেকে জানা গেল, আলেমরা হলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সবচে বড় সমাবেশে (হাশরের মাঠে) সাক্ষ্য বানাবেন।

২. আলেমদের প্রশংসায় আল্লাহ:

আল্লাহ তা'আলা আহলে ইলম তথা আলেমদের প্রশংসা ও গুণ গেয়েছেন। তাঁর কিতাবকে তিনি তাঁদের বক্ষে সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে স্থান দিয়েছেন। এর মাধ্যমে অন্তর পুলকিত হয়, আমোদিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(بل هو عايت بينت في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحَدُ بِايْتِنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ ٤٩ [العنكبوت :٤٩]

'বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না'।

৩. আলেমরা নবীগণের ওয়ারিশ:

তাঁরাই হলেন 'আহলে যিকর' আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞতায় যাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন,

]٧: فشلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)٧] (الانبياء[

'সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান'। ৪. ঈমান ও ইলমের বাহকদের মর্যাদা বৃদ্ধি:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,
يرفع اللهُ الَّذِينَ ءَامَنوا مِنكُم
والذين أوتوا العلم درجت واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١] (المجادلة :١١[

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন'।

৫. মারা গেলেও আলেমের আমল বন্ধ হয় না:

মানুষ বেঁচে থাকে এবং তারপর মারা যায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম শুধু আলেমরা। যে আল্লাহওয়ালা আলেম উপকারী ইলম প্রচার করে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি মারা গেলে পরবর্তী লোকেরা তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হয় আর তিনি নেকী পেতে থাকেন।
ইখলাসের সঙ্গে কাজ করলে তাই তাঁদের নেকী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী নিবন্ধে ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে তা অব্যাহত থাকে: সাদাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ কর।'

৬. আলেম ও তালেবে ইলমের প্রতি আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষণ:

পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসে নিপতিত, সবই বিলয়ের পথে ধাবমান। সব কিছুর ওপরই লানতের বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। সব কিছুর মধ্যে কেবল মানুষের দুইটি শ্রেণী ব্যতিক্রম যাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি ও ইলম অন্বেষণকারী এবং অধিক হারে আল্লাহর জিকিরকারী আবেদ।

যেমন আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

'মনে রেখ, নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত এতে যা আছে তা-ও। শুধু আল্লাহ তা'আলার জিকির ও জিকিরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এবং আলেম ও তালেবে এলেম ছাড়া।'

৭. ইলমের কারণে আমলকারীর প্রতিদান বাড়ে:

ইলমের দ্বারা মুমিনের প্রতিদান বড় হয়। তার নিয়ত হয় পরিশুদ্ধ। ফলে সে নিজ আমল করতে পারে সুন্দর উপায়ে।

মানুষ ইলমের চেয়ে মালের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। অথচ মালের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অনেক বেশি।

এ ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে দুই দল হবে নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা হলেন যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

যেমন কাবশা আনমারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেন,

'তিন শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে আমি কসম করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদীস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো।'
তিনি বলেন, দান-সদকায় কারো সম্পদ কমে না, কোনো ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করা হলে সে যদি তাতে ধৈর্য ধরে তবে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন এবং কোনো বান্দা (মানুষের কাছে) প্রার্থনা বা চাওয়ার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।' (বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা কিংবা) অনুরূপ বাক্য বলেছেন। আর আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলব তোমরা তা স্মরণ রেখ। তিনি বলেন, 'দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য।

(১) সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান করেছেন। ফলে সে এতে তার প্রভুকে ভয় করছে এবং তার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে আর তার ব্যাপারে আল্লাহর হক জানছে, এ হলো সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

(২) সেই বান্দা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু মাল দেন নি। সে হলো সঠিক নিয়তের লোক। সে বলে, যদি আমার টাকা-পয়সা থাকতো তাহলে অমুক ব্যাক্তির মত কাজ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। এদের দুজনের নেকী হবে সমান।

(৩) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা-পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জান দান করেন নি। সে না জেনেই তার টাকা-পয়সা খরচ করছে। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়তা রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহর হকও সে জানে না। সে হলো সবচে নিকৃষ্ট অবস্থানে।

(৪) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ মালও দেন নি জানও দেন নি, সে বলে আমার টাকা পয়সা থাকলে অমুকের মতই (খারাপ কাজ) করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দুজনই গুনাহর দিক থেকে সমান।'

হাদীসটিতে আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত ইলম বলেছেন ওই ইলমকে যা মানুষের সামনে বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত করে। সুতরাং ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি যদি ইলমের শোভায় অলংকৃত না হয় তবে সে সম্পদের অপব্যবহার করে। দেখা যায় সে তা ব্যয় করছে কুপ্রবৃত্তির লালসা পূরণে। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না সে। এ কারণেই তাকে সবচে নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য করা হয়েছে। (আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।)

পক্ষান্তরে একজন আলেম প্রকৃত সম্পদের মূল্য অনুধাবন করতে পারেন। তা কোথায় ব্যয় করা উচিত তা বুঝতে পারেন। ফলে তাঁর ইলমের বদৌলতে তিনি মহৎ নিয়ত করতে পারেন। সম্পদ না থাকলে তার নিয়ত করেও পারেন সর্বোত্তম মর্যাদা অর্জন করতে।

৮. আলেমের ক্ষমা প্রার্থনা: ইলমওয়ালাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সব কিছুইকে অনুগত করে দেন যাতে তারা তাঁর জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

যেমন: আনাস ইবন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'ইলমের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব কিছুই মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত।

৯. তালিবুল ইলমদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ করেছেন

যেমন আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'অচিরে তোমাদের সমীপে ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে নানা দল আসবে। তোমরা যখন তাদের দেখবে, বলবে, স্বাগতম স্বাগতম হে ওই সম্প্রদায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। অতপর তোমরা তাদের ইলম শেখাবে।

১০. আলেমদের চেহারা উজ্জ্বল হওয়া এবং তাদের সচ্ছলতা।

আহলে ইলম যারা আল্লাহর দেয়া শরীয়তের জ্ঞান পৌঁছে দেন মানুষের কাছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ মত তারা হলেন মানুষের মধ্যে সবচে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট এবং তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল (কারো কারো ব্যাখ্যা মতে ওই ব্যক্তিকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে) রাখুন যে আমার কথা শোনে অতঃপর তা (অপরের কাছে) পৌঁছে দেয়। কেননা, ফিকহ বা ইলমের অনেক বাহক আছে যে (আসলে) ফকীহ বা আলেম (ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত) নয়।
আবার অনেক ফিকহ বা ইলমের বাহক আছেন যিনি তা পৌঁছে দেন এমন ব্যক্তির কাছে যে কি না তার চেয়েও বড় ফিকহবিদ।

১১. ইলমের মাধ্যমে নবীদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ:

ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলবর্গকে দেয়া ইলমকে আপন দান ও অনুগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকেই এ দানের মাহাত্ম্য অনুমেয়।
আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وأنزل الله عليك الكتب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١٣
) [النساء: ١١٣]

'আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে মহান।

আপন বন্ধু ইবরাহীমের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,
إِنَّ إِبْرهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ١٢٠ شاكرا لأنعمة أجتبية وهدية إلى صرط مستقيم ١٢١] (النحل :١٢٠، ١٢١[

'নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সে ছিল তার নিয়ামতের শুকরকারী। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشدَّهُ اتَينه حكما وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ٢٢] (يوسف :٢٢[

'আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, আমি তাকে হিকমত ও জান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,
)وَلَمَّا بلغ أشده واستوى اتيله حكما وعلماً وكذلك تجاري الْمُحْسِنِينَ ١٤] (القصص :١٤

'আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

ঈসা ইবন মারইয়াম মাসীহ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,
يعيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى ولدتك إذ أيدتك بِرُوحِ الْقُدسُ تَكَلَّمُ النَّاسَ فِي المهد وكيلا وإن علمتك الكتب والحكمة والتورية والإنجيل] (المائدة :١١٠[

'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার ওপর ও তোমার মাতার ওপর আমার নি'আমত স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল।'

১২. ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার মর্যাদা ও সৌভাগ্য:

আলী ইবন আবী তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন

'ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দিক হলো যে-ই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় সে এ কারণে আনন্দিত হয়। এমনকি সে যদি ইলমের অধিকারীও না হয়। পক্ষান্তরে যে ইলম থেকে সরে যায় এবং অজ্ঞতায় জড়িয়ে পড়ে তা তার জন্য কষ্টকর মনে হয় এবং এ কারণে সে মর্মপীড়া অনুভব করে। এমনকি সে যদি অজ্ঞও হয়।

১৩. লোকদের মধ্যে ইলমের অধিকারীগণই সবচে বেশি ভয় করেন আল্লাহকে:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَمِنَ النَّاسِ والثواب والأنعم مختلف الونه كذلك إنَّما يخشى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا إِنَّ اللَّهَ
عزيز غَفُورٌ ٢٨] (فاطر :٢٨)

'আর এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
إن الذين أوتوا العلم من قبلة إذا يتلى عليهم يدرون للأدفان سجدا ١٠٧ وَيَقُولُونَ سَبّحْن ربَّنَا
إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لمفعولا ١٠٨ وَيَدَرون للاذقان يتكون ويزيدهُمْ خَشَوْعًا ١٠٩ (الاسراء:
١٠٧، ١٠٩]

'নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব। আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে'। 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

১৪. আলেমগণ সেরা মুজাহিদদের অন্যতম:

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে জিহাদ করা। এটিই নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। কারণ ইলম অর্জনে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রুও বেশি।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ولو شبنا لبعثنا في
كل قرية لديرا ٥١ فلا تطع الكفرين وجهدهم به جهادًا كبيرا ٥٢] (الفرقان :٥١ ٥٢]

'আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।' ইবনুল কায়্যিম রহ, বলেন,

'এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। একে মুনাফিকদের বিরুদ্ধের জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না। তারা বরং দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত। কখনো তারা মুসলমানের সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই শরিক হত।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
يأَيُّهَا النَّبِي جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنفقين
واغلط عليهم ومأويهم جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ٩] (التحريم :9]

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও। আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

আর বলাবাহুল্য, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ, ইলম অর্জন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান- সবগুলোই সাবিলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখাবার অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে।

১৫. ইলমের প্রচারেই (ইলম প্রচারে ঐকান্তিক প্রয়াসের কারণেই) আলেমদের মর্যাদা:

আল্লাহ তা'আলা কেবল দু'টি বিষয়ে পরস্পর হিংসা (ঈর্ষা) পোষণ বৈধ রেখেছেন।
সম্পদ ব্যয় এবং ইলম ব্যয়।
আর এটি করা হয়েছে এ দু'টি জিনিসের মর্যাদার কারণে। আর মানুষকে নানা ধরনের কল্যাণ আহরণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

যেমন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'দুইটি বিষয়ে কেবল হিংসা করার অনুমতি আছে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। অতপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ওই ব্যক্তি যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন। ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তার শিক্ষা দেয়।

ইলম ও আমলের উপর গর্ব করার অবকাশ নেই

নিজের ইলমের উপর যদি কারো গর্ব ও অহংকার থাকে তাহলে সে শুনে রাখুক, এ পৃথিবীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি ইলম কাউকে প্রদান করা হয়নি।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন,
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে
যে ইলম প্রদান করেছি তা অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিতে পারি।
لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا
তারপর কেউ আপনার তত্ত্বাবধায়ক হবে না। লক্ষ্য করুন, আয়াতে কেমন কঠোর বাণী বলা হয়েছে। এহেন কঠোর সম্বোধনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে যাওয়ার কথা। এমনকি এতে নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কথা। এজন্য পরে একটি অংশ বৃদ্ধি করে সান্ত্বনা দিয়েছেন।
اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
সে সময় একমাত্র আল্লাহর রহমতই আপনার সঙ্গ দিতে পারে। অন্য কিছু সঙ্গ দিতে পারবে না।

এ অংশটি বৃদ্ধি করে ক্ষান্ত করা হয়নি। কেননা, এতে আশ্বস্থ হওয়া যাচ্ছিল না যে, রহমত সঙ্গ দেয়ার বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে কি-না। তাই সামনে আরেকটি বাক্য জুড়ে দেয়া হয়েছে।
إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا
অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ আপনার 'শামেলে হাল' রয়েছে তাই বাস্তবেই রহমত আপনার সঙ্গ দিবে। আপনি এতটুকু পেরেশান হবেন না।
এ বাক্য দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে আস্বস্ত হয়েছেন যে, তাঁর ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবে না। কেবল আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরত ও শক্তি প্রকাশ করা ও বিশুদ্ধ আকীদার জন্য এমনটি বলেছেন।

যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই এমন কথা বলা হয়েছে সেখানে অন্যদের বেলায় কী কথা হবে? আমাদের বিবেক-বুদ্ধি শাণিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

কেউ ইলম বা আমলের উপর গর্ব করলে সেটা হবে তার নির্বুদ্ধিতা। ইলম ও আমলের কোন বিষয় এমন নেই যার উপর গর্ব করা যায়। কেননা, এসব নিজের উপার্জিত বিষয় নয়; বরং সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার প্রদানকৃত। এগুলোকে নিজের মনে করা বোকামী।

অহংকার খুবই ভয়ঙ্কর ব্যধি। এটি হল 'উম্মুল আমরায' বা সকল ব্যাধির মূল। অধিকাংশ আত্মিক ব্যাধি অহংকারের সাথে সম্পৃক্ত ও তার উপর নির্ভরশীল। যেমন ক্রোধ একটি বড় ব্যধি। এটি অহংকারের কারণেই সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মুখ থেকেই এ কারণটি প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন কোন কোন বদমেজাজ ব্যক্তি রাগের মুহূর্তে বলতে থাকে, তুই জানিস আমি কে? এবার বোঝা গেল, অহংকার কি পরিমাণ মন্দ জিনিস। আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক অন্তরই এ থেকে পবিত্র পাওয়া যাবে। [আত তাবলীগ-৫/১৮]

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব [রহ.] একদিন বলেন,

এতদিন যাবত আমার তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। একথা বলে মসজিদে গিয়ে দেখেন মুসল্লীগণ নামায পড়ে বের হচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে দিয়েছেন। [হুসনুল আযীয-২/২১৪]

ইলম প্রচারে লৌকিকতার কুফল

ইলম প্রচার হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এতে কোন প্রকার লৌকিকতা থাকবে না। যদি নিয়ত ঠিক থাকে তাহলেই ইলম প্রচারে নেকী পাওয়া যাবে।

নিয়ত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন إِنَّمَا الأعمال بالنيات

'নিয়তের উপর সকল কাজ নির্ভরশীল'।

আরো কঠিন বিষয় হ'ল কোন বিষয় জানার পর প্রচারের সাথে সাথে আমল করতে হবে। নচেৎ ক্বিয়ামতের মাঠে তা বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে।

হাদীছে এসেছে,

'যে ব্যক্তি ইলম শিখেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করত, ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে নিজ প্রদত্ত নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর তারও স্মরণ হবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সকল নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি কী করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি ইলম শিখেছ ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে আলেম বলা হবে। আর কুরআন তেলোয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে মুখের উপর ভর করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অহংকারই ধ্বংস ও পতনের মূল

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا

অর্থাৎ কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। এ আয়াতের আলোকে কুফরকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলা হবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

অর্থাৎ অহংকারীদের ঠিকানা কতই না মন্দ। উক্ত আয়াতের আলোকে অহংকারকে এ মন্দ পরিণামের কারণ বলা হবে। উভয় আয়াতে অপরাধী একই দলভুক্ত।

অর্থাৎ এ দলটির জাহান্নামে যাওয়ার দু'টি কারণ বর্ণিত হয়েছে। তা হল কুফর ও অহংকার। লক্ষ্য করুন, উভয়টি একই জিনিস। অর্থাৎ একটি বিষয়ের দু'টি নাম। যেমন বাঘকে اسد এবং ليث উভয় শব্দে বোঝানো হয়। অথবা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। প্রতিটি বিষয়ই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। তাহলে বুঝতে হবে উভয়টির মাঝে কী সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে বুঝুন যে, উভয়টি একটি বিষয় বোঝায় না। কেননা, কুফর ও অহংকারকে কেউ সমার্থবোধক বলেনি।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তাহলে বলা হবে উভয়টি জাহান্নামে প্রবেশের আলাদা আলাদা কারণ। কিন্তু উভয়টি স্বতন্ত্র কারণ নয়; বরং একটি হল কারণ অপরটি কারণের কারণ। আরেকটু খুলে বল্লে, এখানে দু'ধরনের কারণ রয়েছে। একটি কারণ অপরটি কারণের কারণ। কুফর এবং অহংকার দু'টোকেই জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা গেলেও মূলত কুফর হল নিকটতম কারণ। আর অহংকার দূরবর্তী কারণ। অর্থাৎ অহংকার কুফরীর কারণ আর কুফর জাহান্নামের কারণ। এ কারণেই কুরআন কারীমের কোথাও অহংকারকে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে আবার কোথাও কুফরকে কারণ বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, বাস্তবেই কুফর এবং অহঙ্কারের মধ্যে অহংকারই হল মূল। আর কুফর হল তার পরিণাম বা শাখা।

এটি কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে বিধায় এ ক্ষেত্র فبئس مثوي المتكبرين বলা সম্পূর্ণ যথার্থ হয়েছে।

এ আলোচনার ভিত্তিতে সকল আকীদা বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, গবেষণায় জানা গেছে আকীদা এবং আখলাকের সকল খারাবী ও বির্যয় অহংকার থেকেই সৃষ্টি হয়।

এ অহংকারই সকল মন্দ স্বভাবের মূল। আর অহংকারের পরিণতি বলা হয়েছে জাহান্নামে প্রবেশ।

সুতরাং এতে সকল ভ্রান্ত আকীদা ও মন্দ চরিত্রের কথা এসে গেছে।

অহংকার হৃদয়ের ভেতর ছাইবেষ্টিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো লুকিয়ে আছে। এ অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তা প্রকাশিত হয় আগুন প্রজ্বলিত হবে তখন নিভিয়ে ফেলব। কারণ আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলে তা কারো নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে না। সব কিছুই সে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুণের চেয়ে নিভু নিভু কয়লার প্রতি বেশি নজর রাখুন।

কেননা, আগুনের দিকে সকলেই নজর রাখে এবং আগুন দেখলে মানুষ সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু নিভু নিভু কয়লার প্রতি দৃষ্টি কম দেয়া হয় এবং সে ভেতরে ভেতরে নিজের কাজ করেই যায়। (আস্ সাওকু লি আহলিশ্ শাওক)

ইলম ও অহংকার এবং আলেম ও অহংকারী

অহংকার হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাধি। এটি আলেমদের ভাগে পড়েছে, মূর্খদের মাঝে এমন বড় ব্যাধি কমই পাওয়া যায়। আলেমদের যেমন মর্যাদা বেশি, তাদের মাঝে সৃষ্ট ব্যাধিও জটিল।

কেউ যথার্থই বলেছে, افة العلم الخيلاء ইলমের বিপদ হল অহংকার। একথাটির দু'টি মর্ম হতে পারে।

প্রথমটি হল, ইলম থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়টি হল, অহংকার ইলম অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক।

যে কোন অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, ফল এই দাঁড়াবে যে, অহংকার ইলমের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

সুতরাং যার কলবে অহংকার থাকবে তার কলবে ইলমের নূর থাকতে পারে না।

যেসব আলেম অহংকারের ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের চেয়ে মূর্খরাই ভালো আছে। কেননা, তাদের মাঝে এত বড় ব্যাধি নেই। আর যে ইলমের সাথে অহংকারের মিশ্রণ রয়েছে তার চেয়ে ঐ মূর্খতাই শ্রেয় যার মাঝে অহংকার নেই।

এ আলোচনা শুনে হয়ত কেউ বলতে পারে, ইলমের বদনাম করা হচ্ছে । অথচ ইলম সর্বাবস্থায় ভালো জিনিস। ইলমই হলো এমন জ্যোতি যার আলোকে ভালো-মন্দ পার্থক্য করা যায়।

চশমা ব্যবহার করা হয় চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। কিন্তু চশমা দ্বারা উপকার তখনই সাধিত হয় যখন তা নিয়ম মতো ব্যবহার করা হবে। তা না করে যদি কেউ চশমা কানে ঝুলিয়ে রাখে তাতে কোন উপকার নেই। অথবা যদি চশমার আয়নায় রঙ কিংবা চুনার প্রলেপ মেখে দেয় তাহলে তা কী কাজ দেবে। এমন চশমা থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। কেননা, সেটি তো চোখের অবশিষ্ট জ্যোতিটুকুও নষ্ট করে ফেলবে। সেই সাথে অযথা একটি বোঝা বহন করার কষ্ট সহ্য করতে হবে।

ইলমেরও একই অবস্থা। ইলমকে যদি তার নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তার দ্বারা নিজের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তা খুবই উপকারী বস্তু এবং আদ্যোপান্ত আলো আর আলো। যদি তার দ্বারা উক্ত কাজ না নেয়া হয়; বরং অন্যের সাথে তর্কে জিতা এবং বড় হওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে নিষ্ফল ও ক্ষতিকর। সুতরাং একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইলম সব অবস্থায় ভালো জিনিস নয়; বরং কখনো কখনো সেটি নিন্দারও যোগ্য।

ইসলামী জ্ঞানই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

ইসলামের মতো মহান নি'আমত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া ও ইহসান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
:يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَتَّقُوا اللَّهَ حَق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مستلفون)١٠٢[(آل عمران
[١٠٢

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না"।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَد من الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلل مبين ١٦٤] (آل عمران :١٦٤[

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল"।

ইসলাম এত বড় ও মহান নি'আমত হওয়া স্বত্বেও মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখা বা ইসলাম বিমুখ করার অসংখ্য অনুসর্গ ও কারণও দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। সে বিষয়গুলো যেমন জানা জরুরি তেমনিভাবে যেগুলো ইসলামে প্রবেশের পথে বাধা বা ইসলামকে মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দেয়, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকাও জরুরি। যাতে এ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা যায়।

শেষ জামানায় দুনিয়াতে অনেক বড় বড় ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং নতুন নতুন ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে। তখন মানুষ ফিতনার মধ্যেই জীবন যাপন করবে-ফিতনার বাইরে কেউ থাকতে পারবে না। কেউ হয়তো কম ফিতনার সম্মুখীন হবে আবার কেউ অধিক ফিতনার সম্মুখীন হবে। কিন্তু ফিতনা থেকে কেউ নিরাপদ থাকতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন।
আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وإِنَّمَا أمولكم وأولدكم فتنة والله عنده أجر عظيم ١٥] (التغابن :١٥[

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান"। I

বর্তমান যুগের বিভিন্ন ধরনের ফিতনা যেমনঃ মানুষ মানুষের জন্য ফিতনা, ধনীকে গরীব দ্বারা পরীক্ষা, দলাদলি ও মতবিরোধের ফিতনা, যৌনাচারের ফিতনা, নাস্তিক্যবাদের ফিতনা, মুরতাদদের ফিতনা, ইসলামের ওপর বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক ও অবান্তর দোষ চাপানোর প্রবণতা ইত্যাদি ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন মানুষের মধ্যে দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা এবং এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা। যাদের দূরদর্শিতা না থাকে, দীনের জ্ঞান না থাকে এবং সত্যিকার ইলম না থাকে, তারা অনেক সময় এ ধরনের প্রযুক্তিকে মনে করবে এটি তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি।

আখেরি উম্মত যখন তাদের মধ্যে গোমরাহী, দলাদলি, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও খারাবী বেড়ে যাবে তখন তারা কোনভাবেই সংশোধনে উপায় খুঁজে পাবে না। একমাত্র তাদের সংশোধনের উপায় হলো তাদের পূর্ব মনীষীর যে উপায়ে সংশোধন হয়েছে তা। আর তা আল-হামদুলিল্লাহ এখনো অবিশিষ্ট আছে। তা হলো, আল্লাহর কিতাব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতে রাসূল সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এ ধরনের আলেম যারা আমাদের সমস্যাগুলো কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে সমাধান দিতে সক্ষম।

ইলম হাসিলে ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বসুরীদের কিছু বাণী

পূর্বসুরী বুযুর্গদের ইলম হাসিলের গুরুত্ব ও তাদের নিয়ত এবং এ ব্যাপারে অন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়ার বিষয়ে নিম্নলিখিত বাণীগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়। আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তি সত্যের পথে তার নিয়তকে খাঁটি করবে, যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়, তবে আল্লাহ তার এবং মানুষের মধ্যস্থিত সম্পর্কের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে নিজেকে ওই জিনিস দ্বারা সুসজ্জিত করবে যা তার ভেতরে নাই, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।'

তথ্যসূত্র

১, আল ইলমু ওয়াল উলামা

২, কিতাবুল ইলম

৩. তালিবে ইলমের জীবন গঠন

৪, মাসিক আল কাউসার

৫, মাসিক আত তাহরিক